উপন্যাস সিরিজের দশম সংখ্যা

দরিয়া।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

১লা আষাঢ়, ১৩২৭।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,
শিশির পাব্লিশিং হাউস্ হইতে
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৯৬নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
এল্, এন, প্রেস হইতে
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।


উপহার
তারিখ

গোড়ার কথা।

আজ "দরিয়া" পুস্তকে যাহা লিখিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সর্ব্বজন-পরিচিত ভাব ছিল। তাই ৺শিশির কুমার ঘোষের "অমিয় নিমাই চরিত" তখন অত বিকাইয়াছিল। এখন শুনিতেছি বাঙ্গালীর পুরুষ পরম্পরাগত ভাবসম্পত্তির কথা আধুনিক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বুঝিতে পারেন না। আমি যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহার যদি ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা হইলে সাধন-তত্ত্বের গোড়ার কথা বুঝাইতে হইবে। সে চেষ্টা না হয় অন্য পুস্তকে করিব।

"দরিয়ায়" পরকীয়া-তত্ত্ব একটু ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরকীয়া বলিলে এখন অনেকে যাহা বুঝেন উহা তাহা নহে; উহা পরস্ত্রী-গমনের নামান্তর নহে। যাহা পরের ভাব তাহাকে আমার ভাবের সহিত মিলাইয়া পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলে, তবে পরকে আপন-জন করিতে পারা যায়, তবে বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিকে আমার বলিয়া এক করা চলে। Universal Brotherhood কথার কথা নহে। ভাব-বৈষম্য বশতঃই নর-নারীর মধ্যে, জাতি সকলের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিরোধ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়াবাসী ও ইয়োরোপবাসী—এই যে বিভেদ ও বিচার ও জাতি-পার্থক্য ইহা ভাবগত বৈষম্য জন্য ঘটিয়াছে। এ বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা জগতে সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধ প্রচারকগণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের পথে তাহারা নর-সমাজের একীকরণ ব্রত গ্রহণ করেন।

তাঁহাদের পরে ইস্‌লাম অন্য রকমে জগতটাকে মোসলেম বানাইয়া এক করিতে চাহেন। পরকীয়া-তত্ত্ব এই চেষ্টার সাধন-পদ্ধতি। সহজ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ও পথে জগতের বৈচিত্র্য দূর হইবার নহে; ও পথে দেশ, কাল, পাত্রের প্রভাব এড়াইয়া উপরে উঠা যায় না। তাই তাঁহারা পরকীয়া-সাধনার নানা ক্রমঃ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "দরিয়ায়" একটা ক্রমঃ আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুলা ক্রম ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেব তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালী তাহা দেখিয়া ঠিক মত বুঝিতে পারে নাই। ৺কেশবচন্দ্র "নববিধান" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়া গোড়ার প্রথম স্তরটা বাঙ্গালীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। সেই তত্ত্বটাকে রোচক ও অর্থবাদে মোড়ক করিয়া "দরিয়া" পুস্তকে আমি খোলসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা সার্থক হইল কি না বলিতে পারি না।

আধুনিক ইংরেজী-নবীশ সমাজ ছাড়া বাঙ্গালায় এখনও একটা বৃহত্তর ভাবুক সমাজ আছে। তাহাদের কোন সমাচার আমরা রাখি না; কেবল মন্দটুকুই দেখিতে পাই। সে সমাজে সহজ-মত, কিশোরী-ভজন, পরকীয়া-সাধন এখনও প্রচলিত আছে। সদ্‌গুরুর অভাবে এ সকল মত ও সাধনা অতি মাত্রায় বিগড়াইয়াছে বটে, পরন্তু খোঁজ করিলে এখনও ভাল ভাবুক ও রসিক মানুষ পাওয়া যায়।

শেষ কথা—সন্ন্যাসী সমাজের কথা। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী সমাজ একটা বিরাট, বিশাল, দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার। যে একটু দেখিতে পাইয়াছে সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া আছে। এই যে তোতাপুরীর সময় হইতে বাঙ্গলায় আবার ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী প্রাধান্য বাড়িয়া যাইতেছে,

পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ভোলাগিরি, কাঠিয়া-বাবা, বাবাজী দয়ালদাস, অঘোরী বাবা, বাবা ঠাকুরদাস, প্রভৃতি আজ ষাট বৎসর কাল বাঙ্গালায় কাজ করিয়া স্ব স্ব পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন এবং এখনও নূতন অনেকে কাজ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেন্দ্রগত কেন্দ্রী মহাপুরুষগণের যে ইঙ্গিত আছে, আমি তাহাই একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। সখের উপর এ কাজ করি নাই, আদেশ বশতঃই এটুকু করিলাম। ভাল-মন্দের বিচার আমি করিবার অধিকারী নহি, আমি হুকুমের চাকর মাত্র।

তৃতীয় খণ্ডে "নন্দ" নামক উপন্যাসে আমি বাকি কয়টা কথা বলিয়া শেষ করিব। শ্রীমান শিশির কুমার মিত্র আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন, কেননা, তিনি প্রকাশ না করিলে, এ সব কথা আমি লিখিবার অবসর পাইতাম না। আর শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ পাল এ পক্ষে আমাকে উত্তেজিত না করিলে, অনবরত তাগাদা না করিলে আমার মত স্থবির মানুষের পক্ষে এত কথা লিখিবার সুবিধাই পাইতাম না। আশীর্ব্বাদ করি, উভয়ে চিরজীবী হউন, সাধুমন্তের সেবক হউন। ইতি—

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দরিয়া।

প্রথম তরঙ্গ।

রূপ।

দরিয়া।

(১)

পৌষ মাসের প্রাতঃকাল, তখনও কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ গাছের ডগায়, চিলের ছাদে আসিয়া স্পর্শ করে নাই, সেই সময়ে এক বৈরাগী খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে একটি গলির মধ্যে তোফা একটি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং গান ধরিল ঃ—

দীন নাথের চাহিতে যে হবে।
এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে॥
যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর,
তবে জগৎ জনে বলবে কেন হে কাঙ্গালের ঠাকুর।
যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল,
তবে ভক্ত জনে বলবে কেন হে ভকত-বৎসল।

গানের স্বর আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, সহসা বাটীর সম্মুখের দরজা

খুলিয়া গেল, ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "এস বাবা গান করবে এস।" বৃদ্ধ বৈরাগী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সম্মুখেই উঠান, সেই উঠানের এক কোণে চৌবাচ্ছা, চৌবাচ্ছার উপর এক কোণে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন---যেন একটি প্রতিমা—আলুলায়িত কেশা! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এলাইয়া ঢেউ খেলাইয়া ভরা চৌবাচ্ছার জল পর্য্যন্ত যাইয়া পড়িয়াছে, ছোট্ট মুখখানির উপর কোঁকড়া কোঁকড়া চূর্ণ কুন্তল চন্দ্রকলার ন্যায় কপালের উপর অযত্নবিন্যস্ত হইয়া আছে। আর তাহারই নীচে আকর্ণবিশ্রান্ত পটলচেরা দুইটি চক্ষু। ঘন কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের নীচে ঘন কৃষ্ণতার দুইটি চক্ষু, দুই কোণে একটু একটু লোহিত আভা আর তাহার উপর বাঁকান ঘোরাণ ঘন কৃষ্ণ পল্লবরাজী বিরাজিত। বালিকা নয়নময়ী; বালিকা বলিলাম কারণ তাহার চোখের উপর যৌবনের প্রগাঢ়তা ও স্নিগ্ধতা এখনও প্রকট হয় নাই, চক্ষু দুইটিতে অনবরত খঞ্জনের খেলা চলিতেছে, কিন্তু সে ক্রীড়ায়, সে নর্ত্তনে কোনও পদ্ধতি নাই, কোনও শৃঙ্খলা নাই, কেবল নাচিতেছে, কেবল ঘুরিতেছে, কদাচিৎ পদ্মপলাশ বিস্তারের ন্যায় বিস্ফারিত, কখনও বা সান্ধ্য সরসীবক্ষে কমল যুগলের ন্যায় অর্দ্ধনিমীলিত। বালিকা গৌরাঙ্গী—প্রায় শ্বেতাঙ্গী, ক্ষীণ দেহ যষ্টি একখানি নীল শাটিতে মোড়া, মণিবন্ধে দুইগাছি সাদা পালিশ করা সোণার বালা, আর নিত্য অলক্তকরাগ রঞ্জিত ক্ষুদ্র দুইখানি চরণের উপর একজোড়া নূপুর শোভা পাইতেছে।

বালিকা পা দোলাইয়া নূপুরের ঝঙ্কার তুলিয়া, কাণের দুইটি নীলকান্ত মণির দুল দোলাইয়া, চোখ দুইটী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নীচের ঠোঁটটি একটু উল্টাইয়া বলিল,---ও বাবা! আবার গাও—ঐ গানটিই গাও।

বৃদ্ধ বৈরাগী বিস্ময়ে অবাক, তাহার দুই হাতের দুইখানি খঞ্জনী অসাড় ভাবে যেন ঝুলিতেছে, হাত দুইখানি অর্দ্ধপ্রসারিতভাবে রহিয়াছে,—দক্ষিণ চরণ একটু আগাইয়া, বাম চরণখানি অর্দ্ধেক তুলিয়া সে কেবল দেখিতেছে। বৃদ্ধ সত্যই হাঁ করিয়া দেখিতেছে, জ্যোতিঃহীন কোটরগত দুইটি চক্ষু যেন ঠিকরিয়া বাহির হইতে চাহে—সে কেবলই দেখিতেছে! এমন ত দেখে নাই। এমন অনিন্দ্যসৌন্দর্য্য, এমন নিরাবিল নির্ম্মল বিলাসবর্জ্জিত সহজ সৌন্দর্য্য ত আর দেখে নাই। সে দেখিতে লাগিল, ক্ষণেক পরে যেন ঢোক গিলিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা! তুমি কি আমাদের রাধারাণী?

বালিকা মুচকি হাসির বিদ্যুৎদাম ঝলসিয়া, কুন্দদন্তের শুভ্রবিভায় অধরৌষ্ঠের সে রক্তিমাভ আভাকে যেন প্রোজ্জ্বল করিয়া একটি ছোট হুঁ বলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিল "ঐ গানটা গাওনা বাবা।" ভিখারী আবার গাহিল। সে বৃদ্ধ বটে কিন্তু এবার তাহার কণ্ঠ হইতে যেন চাঁছা ছোলা কন্‌কনে টন্‌টনে যৌবনের কণ্ঠস্বর বাহির হইতে লাগিল। সমগ্র গৃহটি স্বরলহরীতে যেন দুলিয়া—ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে যেন কাঁপিয়া উঠিল।

নীচে চৌবাচ্ছার কোণে রূপময়ী আর তাহার সম্মুখে জরাজীর্ণ শব্দময় পুরুষ একজন গান করিতেছে; রূপ প্রতিমা তাহা শুনিতেছে, প্রাঙ্গণ সে গানের তরঙ্গে যেন উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে আর উপরে—ঠিক মাথার উপরে দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পূর্ণ যৌবনের অভিব্যঞ্জনা স্বরূপ রূপের পুরুষকার স্বরূপ একটি পুরুষ। গান ছাড়া অন্য শব্দ নাই, তান মান, লয়, গিটকিরীতে অন্য সকল শব্দ স্তব্ধ! আর সেই স্তব্ধ স্বর সরোবরে এই তিন রূপের বিকাশ!

(২)

দরিয়া। এ কাঙ্গালের দিন কি এমনিই যাবে বাবা ?

বাবাজী। তুমি কিসের কাঙ্গাল মা ? আমার রাধারাণীর রাজ্যে কাঙ্গাল ত নাই।

দরিয়া। তবে এ গান কেন ?

বাবাজী। যে রাধারাণীর রাজ্যের খাস তালুকের প্রজা নয়,—হইতে চায়, সেই বুক ফাটাইয়া এই গান গাহিয়াছে।

দরিয়া। আমিও ত তাই। কুটার মত কত স্রোতে ভাসিয়া যে এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছি তাহাত মনে নাই, তাই এই গানটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।

বাবাজী। ছিঃ ও কথা বলিতে নাই। তুমি রূপ, তোমাতে নামের স্পর্শ হইলে প্রথমে সখি হইবে পরে খোদ রাধারাণী হইয়া বসিবে।

দরিয়া হাসিল, হাসিয়াই ঝুপ করিয়া চৌবাচ্ছায় গিয়া পড়িল আর উপর হইতে ঠং করিয়া একটা টাকা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল, যাও, বাবাজী, আজ তুমি এই ভিক্ষা পাইলে, কাল আবার আসিও, আবার এমনিই ভিক্ষা পাইবে।

বাবাজীরও শুষ্ক শীর্ণ অধরোষ্ঠ হাসির রেখায় ফুটিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"আমরা বাবা টাকার ভিখারী নহি, আমরা নাম বিলাইয়া বেড়াই, রাধারাণী আমাদের উদরান্নের ব্যবস্থা করেন। তোমার টাকা তুমি রাখ আমি আজ যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়াই কৃতার্থ হইলাম।"

বাবাজীর কথা শেষ হইতে না হইতে দরিয়া চৌবাচ্ছা হইতে উঠিল

এবং এক লম্ফে প্রাঙ্গণে আসিয়া টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া, সিক্ত বস্ত্রে জলদেবীর ন্যায় অগ্রসর হইয়া সম্প্রসারিত হস্তে টাকাটি বাবাজীর হস্তে দিয়া বলিল, "নে বাবা নে, তোর মেয়ে তোকে দিচ্ছে।" বাবাজী খঞ্জনীতে একটু ঝঙ্কার দিয়া মুচকি হাসিয়া হাসিয়া গান ধরিল :—

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণখানি দহিয়া মোর।"

বাবাজী টাকা লইল না। কেবল তালে তালে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। সুকুমার নীচে নামিয়া আসিলেন এবং দরিয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন "চল উপরে যাই। বড় শীত, এ শীতে বাসি চৌবাচ্ছার জলে স্নান কর কেমন করিয়া?" দরিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন পরন্তু তাঁহার নূপুর ও মেখলা তাঁহার গতিকে মুখর করিয়া চলিল। দরিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বেশ বদলাইয়া আসিলেন, ছিল নীল শাড়ি, বাহিরে আসিলেন একখানি পীতাম্বরী পরিয়া। ততক্ষণ সুকুমার চা তৈয়ার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। দরিয়া আসিয়া একখানি কেদারায় বসিল এবং চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া উপর্য্যুপরি দুই পেয়ালা চা পান করিল। উভয়ের মধ্যে কোনও কথাটি নাই, প্রাতঃরাশ শেষ হইলে সুকুমার নিরাশ ভাবে বলিলেন,—"আমিও বলি, দরিয়া এ কাঙ্গালের দিন কি এমনিই যাবে? একবার চাও, আমার দিকে তাকাও, এ কাঙ্গালের দিন কি এমনিই যাবে?" দরিয়া হাসিলেন, এবং বলিলেন,—"দিন ত এমনিই যায়, সূর্য্যের উদয় অস্ত হয়, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন হয়, আর সেই দিনরাত্রে কখনও বা আমাদের কাঁদিতে হয়, কখনও বা হাসিতে হয়। ইহা ছাড়া নূতন রকমে কখনও কাহারও দিন গিয়াছে কি? দিন যেমন যাইবার তেমনই যাইবে।"

সুকুমার। আমার দিন ত এমন যায় নাই। এ যে তুষানলের জ্বালা অহর্নিশি ভোগ করিতে হইতেছে।

দরিয়া। যায় নাই বল কি? এ পুরাতন দুনিয়ায় নূতন কিছু হয় না। কেবল রকমফের মাত্র। ভোগাইয়াছ—ভুগিবে না?

সুকুমার। কাকে ভোগাইলাম?

দরিয়া। যাহারা ভুগিতেছে তাহারাই জানে। এ দুনিয়াটা আগুন আর পোকার দেশ। কোনও পোকা পোড়ে, কেহ বা পুড়িতে যায়। আর কেউ বা আগুনের ভিতরে থাকিয়া অন্য দশটাকে পোড়ায়। আমি পুড়িয়াছি এখন তুমি পোড়।

এই বলিয়া দরিয়া নূপুরের ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং

"চুণী চুণী কলিয়াঁ মলিয়াঁ বানাওয়ে
আরে রে যৌবন ধন মওচোল রাঙ্গাওয়ে"

এই টপ্পা গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে ন্যুব্জ কুব্জ হইয়া হাত দুইটি বিস্তারিত করিয়া চুলভরা মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, কোমর দুলাইতে দুলাইতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কোন পটীয়সী গায়ীকা ও নর্ত্তকী অমন হাব ভাব ফুটাইয়া নাচিয়া গান করিয়া যাইতে পারে না। দরিয়া যেন রূপ-লাবণ্য, পৌষের বাত্যাবিক্ষুব্ধ বৃক্ষপত্রবিশ্রস্ত শিশিরসম্পাতের ন্যায় ঝরিয়া ছড়াইয়া চলিয়া গেল। আর সূর্য্যাস্তের পরে লোহিতাভ পশ্চিম চক্রবালে সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া যেমন ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে, তেমনই পূর্ণ যৌবন সুকুমারের অপরূপ রূপলাবণ্যের লোহিতাভার উপর যেন দুশ্চিন্তার কৃষ্ণ যবনিকা আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সুকুমার কেবল তাকাইয়া রহিলেন—নির্নিমেষ নয়নে নির্ব্বাতনিষ্কম্পপ্রদীপের ন্যায় কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

হায় রূপ! তুমি কখনও খেলা খেল, কখনও বা নিথর গভীর জলের মত কেবল অতলতলে তলাইয়া যাও, তুমি কখনও বিকাশ কখনও বা সঙ্কোচ—তোমায় ত চিনিতে পারিলাম না। বাল্যলীলায় তোমার এক প্রকার, যৌবনে অন্য প্রকার, আর বার্দ্ধক্যে অনন্তের তটে দাঁড়াইয়া তোমার আর এক প্রকার। তুমি কোথাও বা উত্তালতরঙ্গভঙ্গময় তটিনীর কল্লোল-কোলাহলময় কোথাও বা নীল আকাশের নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যের ন্যায় অজ্ঞেয় অগাধ ও অচল।

(৩)

সুকুমার কলিকাতায় আসিয়া নিয়মিত ব্যারিষ্টারীর ব্যবসায় চালাইতে ছিলেন, যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহার দ্বারায় কলিকাতার সংসার চলিত এবং কিছু কাশীতে সুকুমারীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কলিকাতায় দরিয়া সুকুমারের গৃহকর্ত্রী হইয়াছিলেন। দরিয়া খুব মিতব্যয়ী ঘরণী ছিলেন, গৃহস্থলীর ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সুন্দর করিয়াছিলেন, সে পক্ষে সুকুমারের অনুযোগ অভিযোগের কোনও অবকাশই ছিল না। সুকুমারের দুঃখ, দরিয়া কাছে আসে না, কাছে বসিয়া দুদণ্ড কথা কহে না, মাঝে মাঝে এক এক বার পারাবতের মত দরিয়া সুকুমারের সম্মুখে আসিয়া রূপ ছড়াইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিয়া আবার চলিয়া যায়—ধরা দেয় না, ইহাই সুকুমারের বড় দুঃখ। শিক্ষার গুণে দরিয়া খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ের মতনই হইয়াছিল বটে কিন্তু মরুকান্তারের বালিকার যে উড়ু উড়ু ভাব তাহা দরিয়া একেবারে ছাড়িতে পারে নাই।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সুকুমার

আহারাদি করিয়া নিজের কক্ষে যাইয়া বসিলেন এবং দরিয়াকে ডাকিলেন, দরিয়া অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পরে সুকুমারের নিকট আসিয়া বসিল এবং বলিল ঃ—

"কৈ তুমি আজ বেড়াতে গেলে না ?"

সুকুমার শুষ্ক ভাবে উত্তর করিলেন, না। তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলিব, দরিয়া তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?

দরিয়া। গুরুজীর হুকুম, তাই আসিয়াছি।

সুকুমার। তোমায় আমায় কিসের সম্বন্ধ দরিয়া ?

দরিয়া। তা ত জানি না, আমার যিনি রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা সেই সেনুসী মুসলমান ফকির আমাকে তোমার কাছে থাকিতে বলিয়াছিলেন, আমি আছি।

সুকুমার। সেনুসী কি তোমার জনক নহে ? তবে তুমি কে ?

দরিয়া। না, তিনি আমার জনক নহেন। তিনি আমার পালনকর্ত্তা পিতা, জনকের অপেক্ষাও সহস্রগুণে বড়। তা ছাড়া আমি যে কে, তা আমি জানি না। তবে আমার যেন মনে হয় আমি আরবেরও নহি, আফ্রিকারও নহি, হিন্দুস্থানেরই মানুষ। নহিলে এ দেশটা আমার এত ভাল লাগিবে কেন ?

সুকুমার। আমার প্রতি তোমার কি কোনও কর্ত্তব্য নাই ?

দরিয়া। কিছু না। আমি হুকুমের বাঁদী। আমার পিতা এবং আমার গুরু আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব এবং করিতেছিও।

সুকুমার। এক গুরুর শিষ্য আমরা সে সম্বন্ধ ত আছে। তাহা ছাড়া তোমার পিতাও আমাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে তুমি আমায় ভালবাস।

দরিয়া। হুঁ খুব বাসি—এই বলিয়া বালিকা গান ধরিলেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব কেমন তোমা বই আর জানি নে॥

গানে ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। বাণী শুদ্ধ, স্বর, লয়, তান সব শুদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যেক কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাব যেন উথলিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই খঞ্জন নয়নের খেলা, বিলোল বক্র দৃষ্টির সহিত যেন হাসির লহর দুই নয়ন দিয়া ঢেউ খেলাইয়া বহিয়া গেল, তাহার উপর দেহযষ্টিখানি সমীরসন্তাড়িত পুষ্পবল্লরীর মত কাঁপিতে লাগিল, নাচিতে লাগিল। গান শেষ হইলে দরিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সুকুমারের চিবুকটি ধরিয়া কীর্ত্তনের সুরে আবার গান ধরিলেন—

তোমায় চিনি চিনি করি চিনিতে নারি
তুমি কে বট হে—
শ্যাম নটবর নিতুই সুন্দর, অধরে বাঁশীধর, ধরাধরের ধুরন্ধর,
তুমি কে বট হে—
দেখিছি তোমায় বৃন্দাবনে, নেচে বেড়াতে বনে বনে, গরু চরাতে রাখাল সনে,
তুমি কে বট হে—

এবার সুকুমার সামলাইতে পারিলেন না, তাঁহার দুই নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দরিয়ার হাত ধরিয়া তাহাকে আরও একটু কাছে আনিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—তুমি কে দরিয়া? সত্যই তোমায় চিনি চিনি করি চিনিতে পারি না। আমি যে আর বাঁচি না, তোমার রূপের জ্বালায় আমি যে পুটপাকের দাহে ধিকি

দিকি ছাই হইয়া যাইতেছি—পাগল হইয়া উঠিতেছি, আমায় সামলাও,—আমায় রাখ।

দরিয়া। আমি বৈষ্ণবী, তুমি বৈষ্ণব, উভয়েই এক মন্ত্রে দীক্ষিত, আমি তোমার নারী নহি, ভার্য্যা সেবাদাসী। তোমায় আমায় দেহ সম্পর্ক ত হইতেই পারে না, তুমি যে অন্যের পতি। আমাদের এখন রূপের খেলাই খেলিতে হইবে। আমি দেখিব আর তুমি দেখিবে, আর এই দেখাদেখির খেলায় উভয়ের আত্মা উভয়েতে যাইয়া মিশিবে। গুরুজী কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা ভুলিলে কেন?

সুকুমার। ভুলি নাই কিছু। কেবল বেসামাল হইয়া আছি, কথাটা কাজে পরিণত করিতে পারিতেছি না।

দরিয়া বাম চরণে মাটিংএর উপর একটা ঠমক মারিয়া নূপুরের শব্দ তুলিয়া, বাম হস্ত কোমরের দিয়া দক্ষিণ হস্ত সুকুমারের দিকে সম্প্রসারিত করিয়া কোলকুঁজোর মত একটু বাঁকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন—

হায় রে হায় প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে বদল পেলে
ফুরিয়ে গেল প্রেম পিয়াসা॥

ঠমকে ঠমকে নূপুরের আওয়াজ তুলিয়া অপূর্ব্ব নৃত্যকলার পরিচয় দিয়া দরিয়া এই গানটি করিলেন। গানের পরই বলিলেন,—"চাও তুমি অদল বদল, চাও তুমি দেহের বিনিময়ে দেহ, তাহা ত রূপ সাধনা নহে, তাহাতে ত পরকীয়া সাধনা হয় না। সে সব কথা ভুলিলে কেন?

সুকুমার। আবার বলিতেছি দরিয়া, ভুলি নাই। আলেয়ার আলোর

মত তোমার রূপের ঝলক যখন ফুটিয়া উঠে তখন আমি সামলাইতে পারি না। তোমাকে যেন এক একবার গিলিয়া খাইতে ইচ্ছা করে—আত্মসাৎ করিতে বলবতী বাসনা হয়। কি জানি তুমি কেমন পাষাণী, একা এই নির্দ্বন্দ্ব প্রদেশে তুমি আমি যুবক যুবতী এই ছয় মাস কাল রহিলাম, তুমিই আমায় পাগল করিলে, আমি তোমার প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলাম না।

দরিয়া। আমি যে নারী। তাহার উপর আমি যে বাঁদী। কথা অনুসারে কাজ করিবার সাধনা আমি শৈশব হইতেই শিখিয়াছি। হুকুম তামিল করিতে না পারিলে আমি যে দণ্ড ভোগ করিতাম তাহা তুমি কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। আর তুমি সোহাগের দুলাল হইয়া মানুষ হইয়াছ, বিধাতার চিহ্নিত ও ভাগ্যধর পুরুষ তুমি, এত দিন যাহা চাহিয়াছ তাহাই পাইয়াছ, তাই এখন সামান্য একটু শাসনের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া তোমাকে অস্থির হইতে হইয়াছে। তোমায় আমায় আকাশ পাতাল প্রভেদ!

সুকুমার। তোমায় ব্যথা দিব না, অতীতের ভস্মস্তূপে ফুৎকার দিয়া তোমার হৃদয়ের লুক্কাইত চিতা-চুল্লীকে প্রজ্জ্বলিত করিতে চাহি না। তোমার উপর জোর জবরদস্তিও করিব না। কিন্তু এ যে আমার সত্যই তুষানলের জ্বালা হইল। কি করি দরিয়া—তুমিই বলিয়া দাও এখন আমার কর্ত্তব্য কি? তুমিই চিকিৎসক হইয়া আমায় বাঁচাও, নহিলে আমার যে মরণ ধ্রুব হইয়া দাঁড়াইতেছে।

দরিয়া তড়াক্‌ করিয়া লাফাইয়া যাইয়া সুকুমারের জানুর উপর বসিয়া কাতর ক্রন্দন কণ্ঠে গান ধরিল—

দরিয়া

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

গান শেষ করিতে না করিতেই তখনই হাঁসি মুখে দরিয়া বলিল,—মরিবে ত কিন্তু আমাকে কাহার হাতে দিয়া যাইবে।

সুকুমার হাঁসিলেন—হাসিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—"আমার এ শিক্ষা হইয়াছে যে তোমার মত বালিকাকে আমি যত্ন করিয়া রাখিতে পারি এবং জানি, অত দেহ সুখে সুখী আমি নহি। কিন্তু—নাঃ আর বলিব না।"

(৪)

একটু বেলা হইয়াছে সূর্য্যের কিরণ বিগলিত কনকধারার ন্যায় গাছের পাতায় পাতায় ঢলিয়া পড়িতেছে প্রাসাদের চূড়ায় যাইয়া জড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, আর কাঁচের শার্সীগুলিকে স্পর্শ করিয়া অগ্নিময় করিয়া তুলিতেছে, এমন সময় সেই খঞ্জনীর আওয়াজ, ঋণী ঋণী ঝিনি ঝিনি করিয়া করিয়া ক্রমে শব্দ ঝঙ্কারে পরিণত হইল আর সেই বৃদ্ধ বাবাজী গান ধরিলেন—

রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হল,
এবার বা আসা হয় বিফল ;
ভাবি যাই চুপে চুপে যাই বা কিরূপে,
ছ ঘাটে ঘাঁটি বসিল।
তথায় বিদ্যুতের খেলা কেবল হাসির মেলা।
যাইতে প্রাণ হার মানিল।
যাই যাই করে যাওয়া না হ'ল।

বৃদ্ধ বাবাজীর বাম্বা কণ্ঠের সুর গ্রামে গ্রামে চড়িয়া সুকুমারের ভবন সুরময় করিয়া তুলিল, সুকুমার ছুটিয়া আসিলেন, দরিয়া বেণী বাঁধিতে বাঁধিতে ছুটিয়া আসিল, বাবাজী গান শেষ করিল। একবার দুইবার তিনবার গানটি করিল শেষে একটু হাসিয়া দরিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিল,—কি মা, রূপের খেলা খেলিতেছ ও যে আগুণ নিয়ে খেলা মা, পারিবে কি?

দরিয়া। হারি বা পারি তাহার ভাবনা ভাবি না। হুকুম মালিকের, হুকুম মত কাজ করিয়া যাইতেছি।

সুকুমার। আমরা ঠাকুরের দাস ও দাসী, অবিচারিতচিত্তে ঠাকুরের হুকুম মানাই আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। মরণ বাঁচনের ভাবনা আমাদের ভাবিতে নাই। ছ'ঘাটে ঘাঁটি বসিলেও, ছয় রিপু বাদ সাধিলেও আমরা রূপের পথে অগ্রসর হইব, পুড়িয়া মরি যদি গুরু সামলাইবেন।

বাবাজী। হা! হা! হা! এক রাত্রেই একেবারে লোহা গড়া ইস্পাত হইয়া পড়িলে বাবা, কাল যে পাগলের মত, মচ্‌কান বাঁকারীর মত নচ্‌পচ্‌ করিতেছিলে, আর আজ এমন?

দরিয়া বেণী বাঁধা শেষ করিয়া পীতাম্বরীর অঞ্চল মাটী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—তবে শুন বাবাজী—

স্বপনে মন যে কেমন মনের মানুষ দেখিয়াছে।
সে যে অধর মানুষ দেয় না ধরা ধরিতে মন হার মেনেছে॥

এই গানের এই কলি কয়টি দরিয়া ভাল করিয়া গাহিয়া বাবাজীকে শুনাইল এবং তুড়ির সুরে বলিল—

আমি ধরি ধরি করি ধরিতে নারি অধর চাঁদ আকাশে গেল।
ধরা ছেড়ে অধর অধরে গিয়া লাগিল।

বুঝলে বাবাজী? আমরা লুকোচুরী খেলা খেলিতেছি, চোরও ধরিতে পারিতেছি না, বুড়িও ছুঁইতে পারিতেছি না।

বাবাজী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন—ক্ষণেক পরে বলিলেন, কে গা তোমরা? তোমরা অঘটন ঘটাইবে এই কলিকাতায় আসিয়া লুকাইয়া আছ। এমন যুগলরূপ ত দেখি নাই। এমন লীলাত দেখি নাই, আজ আমার ভিক্ষা সার্থক হইল। কিন্তু এত লুকোচুরী কেন?

দরিয়া। লুকোচুরী না হইলে কি পরকীয়া সাধন হয় বাবা! আমার নহে যে আমার হবে সে, লুকাইয়া না রাখিলে কি আমার হয়? চিলে ছোঁ দিয়ে যে লইয়া যাইবে।

সুকুমার। বাবাজী ঐ গানটা জান?

গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা।
তথা নাই ভেদাভেদ চিন্তা কি খেদ
কেবলি রসেরই খেলা॥

সুকুমার গানটি আবৃত্তিই করিলেন না সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়াও শুনাইলেন। বাবাজী সত্যই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া পড়িল, অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল রূপ দেখি নাই আজ দেখিলাম। শুনা কথা কাণে শোনাই ছিল, আজ দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। এখেলা কত দিন খেলিবে মা? এ যে উৎকট খেলা ঋষি মুনি তপস্বীও যে এখেলা খেলেনা।

সুকুমার। যাহারা পরকীয়ার খবর বলিয়াছে তাহারা এতত্ত্ব জানে এ খেলা খেলে। ইহা যে দেহের অতীত তত্ত্ব, দেহ লইয়া খেলিতে হয় বটে কিন্তু দেহ ছাড়া মজিতে হয়। মজাই কঠিন পারি কিনা জানি না কর্ম্ম ত করিতেছি।

দরিয়া। বাবাজি আজ টাকাটি লইতে হইবে এবং নিত্য আসিয়া এমনি-ভাবে গান শুনাইয়া যাইতে হইবে। দেখনা এ খেলা কতদিন রয়, কাহার সয়।

বাবাজী। তাই হবে মা। আমার রাধারাণীর হুকুম আমি কি অমান্য করিতে পারি। আমি নিত্য আসিব নিত্য দেখিব আর নয়ন পথে আমার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইব। সহজ বটে, অতি কঠিনও বটে যাহা খেয়াল ভাবিতাম তাহা যে সাধনার ধন হইতে পারে এতদিন তাহা জানিতাম না। তুমি শিখাইলে, আমি শিখিব। সন্ধ্যা যে হয়ে এল মা শিখিতে পারিলাম কৈ? এই বলিয়া বাবাজী—

লিখিতে শিখিতে দিলে কৈ

ওলো প্রাণ সই

এই গানটি গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে, টাকাটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

রূপোল্লাস।

কলিকাতার যে পল্লীতে সুকুমারের বাসাছিল, সে পল্লীতে বাঙ্গালীর বাস বড় কম ছিল। মুসলমান আর্ম্মাণী এবং পটুগীজ ফিরিঙ্গীই অনেক ছিল। দরিয়ার কক্ষের ঠিক অপর পার্শ্বে, মধ্যে এক চারিহাত চওড়া গলি ব্যবধান তাহার পরই একটি ত্রিতল বাটী। সেই গৃহে অনেকগুলি

বিদেশী মুসলমান বাস করিত। হোসেন খাঁ নামক একটি যুবক দরিয়ার কক্ষের সম্মুখ কক্ষেই থাকিত। তাহার বেশ সুগঠিত দেহ, সবলসুস্থকায়, দেহের গঠনের সামঞ্জস্য অপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে চোক, মুখ, নাক, কান যে নিখুঁত এমন কথা বলিতে পারি না বরং বলিব মুখে খুঁত অনেক, কিন্তু সে সকল দোষের সমবায়ে এমন একটা পুরুষোচিত লাবণ্য ফুটিয়াছে যাহা অনন্যসুলভ। হোসেন খাঁ ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে, বেশ সঙ্গতিপন্ন পুরুষ। কিন্তু থাকেন একাকী, আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি কুটম্ব তাহার কেহ আছেন কিনা এ খবর কেহ জানে না, আর তাহার ব্যবসার অর্জ্জিত প্রচুর অর্থ যে কোন কাজে লাগে তাহাও কেহ বুঝিতে পারে না তিনি খুব মিতব্যায়ী এমন কি—কঞ্জুস বলিলেও চলে। ট্রামে চড়িয়া আফিসে যাতায়াত করেন, কদাচিত তাহাকে কেহ গাড়িভাড়া করিতে দেখিয়াছে। ঘোড়দৌড় বা অন্য কোনও ব্যসনে তাহার আসক্তি নাই। এমন কি বিশেষ অন্তরঙ্গ সমবয়স্ক বন্ধুও তাহার নাই। চামড়ার রপ্তানীর কাজ তিনি করেন, সেই কার্য্যের খাতিরে যতটুকু কথা কহা তাহাই কহেন। তাহা ছাড়া অন্য কোনও খবর তিনি কাহাকেও বলেন না, লোকেও জানে না।

হোসেনখাঁর কক্ষের দরিয়ার ঘরের দিককার জানালা প্রায় বন্ধ থাকিত, আজ দুইদিন হইতে তাহা খোলা থাকিতেছে। শীতকাল হইলেও জানালা খোলাই থাকে, আর সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় হোসেনখাঁ কি যেন দেখিয়া থাকেন। দরিয়াও লক্ষ্য করিয়াছিল যে তাঁহার কক্ষের অপর পার্শ্বে গৃহের এই জানালাগুলি এতদিন খোলা হইত না। দরিয়াও জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, কেবল দেখাই নহে দরিয়া

হারমনিয়ামের কাছে বসিয়া হারমনিয়াম বাজাইয়া মিশরী দরবেশদের আরবী ভাষায় রচিত দুই তিনটা গজল গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কি জানি কেন দরিয়ার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, অপর পার্শ্বের প্রতিবেশী মিশর দেশের লোক, দরিয়া কেবল গানই করিলেন না নাচিলেনও, কত রকমের হাবভাব ছলাকলা প্রকাশ করিয়া নাচিলেনও। কিন্তু হোসেনখাঁ নীরবে, নিস্পন্দে, কেবল দেখিতেন, দুই ঠোঁট আল্গা করিয়া কখনও একটা শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। একদিন রাত্রে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পর্য্যন্ত দরিয়ার নাচগান চলিতেছিল। সুকুমার সে শব্দ শুনিয়া টিপি টিপি আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, দরিয়া নাচিতেছে ও গান করিতেছে আর সেই মুসলমান যুবক কেবল দেখিতেছে, হঠাৎ সুকুমার পিছন হইতে গিয়া দরিয়াকে ধরিল এবং একটু যেন বিরক্তির স্বরে বলিল,—"দরিয়া, তুমি কাহাকে নাচ দেখাইতেছ ও গান শুনাইতেছ?"

দরিয়া। কি জানি কাকে? লোকটা আঁকা ছবির মত দাঁড়াইয়া কেবল দেখে। আজ তিনদিন হইল সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত কেবলই দেখে। আমি ভাবিলাম যখন এতই দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তখন দেখুক না।

সুকুমার। ও যে মিশর দেশের লোক তাহা বুঝিলে কেমন করিয়া? দরবেশের গজল গান করিতেছ কেন?

দরিয়া। তুমি লণ্ডনে এমন কি রুষ ও জার্ম্মাণীতেও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী চিনিয়া লইতে কেমন করিয়া? কি জানি চোখের একটা কেমন সংস্কার থাকে দেশের লোক দেখিলেই তাহাকে চেনা যায়। আমি সেই হিসাবেই ঠাওর করিয়াছি যে এ লোকটা মিশর দেশের।

সুকুমার। তুমি নিতান্ত মন্দ ঠাওর কর নাই। কিন্তু সত্যই লোকটা তোমার সহিত একটা কথাও কহে নাই ?

এইবার চিত্রার্পিতের তুল্য হোসেনখাঁর ছবি সরিয়া গেল। যাইবার সময় সে মোটা ঠোটের ভিতর দিয়া যেন একটি ক্ষীণ শুষ্ক হাঁসি ফুটিয়াছিল। সুকুমারের তাহা দেখিয়া কেমন যেন একটু কি হইল। কে যেন তাহার মনটাকে একটু মোচড়াইয়া দিয়া গেল। সুকুমার একটু যেন রূক্ষভাবে দরিয়ার কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। দরিয়া সহসা সুকুমারের হাত ধরিয়া বলিল,—"দাঁড়াও। তুমি স্বামী আমি তোমার দাসী বাঁদী, তুমি মালেক আর এ দেহ তোমার। অমন মনটা করিয়া যাইলে ত ঠিক হয় না। তুমি ভাব আমি তোমার হৃদয়ের কোনও কথাই জানি না বা বুঝি না, সেন্নুসী কন্যা আমি, মানুষের হৃদয় পটের মত পড়িতে শিখিয়াছি ; ও সন্দেহ—ও সংশয় কেন ?

সুকুমার। কি সন্দেহ দরিয়া ? আমি ত কোনও কথা তোমায় বলি নাই !

দরিয়া। আমি ঐ লোকটার শুষ্ক হাসি দেখিয়াছি, আর সে হাসির বজ্রাঘাতে তোমার তালবৃক্ষ তুল্য উত্তুঙ্গ হৃদয়টি কেমন জ্বলিয়া জীর্ণ হইয়া গেল তাহাও দেখিয়াছি। তুমি আমার সহিত কপটতা করিও না। তোমার কাপট্যই আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অথচ তুমি আমার কাছে কিছু ঢাকিয়া রাখিতে পার না—পারিবেও না।

সুকুমার। তুমি একটু ভুল বুঝিয়াছ। উহার হাসি আমাকে আঘাত করিয়াছে বটে, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে নহে, আমার ব্যক্তিগত নিজের সম্বন্ধে। ও হাসি প্রেমের নহে, অতি ঘোর প্রতিহিংসার, এই টুকু বুঝিয়াই আমি মনে

মনে সঙ্কল্প করিয়াছি এ পল্লী ছাড়িয়া যাইব, তোমাকে আর একটু সাবধান আরও একটু লুকাইয়া রাখিব। ঐ লোকটি আজ তিনদিন হইতে কি করিতেছে জান! তোমাকে সম্মূঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছে, পারে নাই—পারিবেও না। বৃথা বিপদ ডাকিয়া আনি কেন! এস আমার কক্ষের পার্শ্বের ছোট কক্ষে তুমি শয়ন করিবে। আমি গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।

দরিয়া। উঁহুঁ তা হবে না। ভয়ে পালাইব না, দেখি না লোকটা কি খেলা খেলে। আমিও মিশরের কুমারী সেনুসী কন্যা, আমিও তুক তাক গুণগান অনেক জানি, তাহার উপর আমার একটু কৌতূহলও হইয়াছে, লোকটা যে কে তাহা জানিতে হইবে।

সুকুমার আর কিছু বলিলেন না কেবল শুষ্কভাবে বলিলেন,—"তোমার যা অভিরুচি হয় তাহাই কর, আমি যাই।

দরিয়া। না,—যাইতে দিব না। আজ সারা রাত তোমাকে দরবেশের নাচ গান দেখাইব ও শুনাইব, তুমি বস।

এই বলিয়া দরিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন এবং ক্ষণিক কাল পরে এক অপূর্ব্ব বেশে আসিয়া হাজির হইলেন। দরিয়ার অঙ্গে বস্ত্রমাত্র ছিল না, অথচ দরিয়া নগ্না নহেন সম্পূর্ণ সমাবৃতা। নানা বর্ণের কাচের মালা ছোট বড় করিয়া তাঁহার দেহের উপর সাজান। লাল, নীল, শ্বেত, পীত, সপ্ত বর্ণের কাচের রাজি তাঁহার অঙ্গে এমন ভাবে সাজান বা বসান যে সহসা দেখিলে মনে হয় তিনি মানবী নহেন,—প্রজাপতি। মাথায় একটি বড় টায়রা, সেই টায়রায় হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি নানা বর্ণের মণি মাণিক্য খচিত আছে এবং তাঁহার দুই দিকের গৃহ কক্ষকে যেন

বিদ্যুতের রেখায় ঝলসিয়া তুলিয়াছে। দরিয়ার আজানুবিলম্বিত কেশরাশির উপর মুক্তার মালা জড়াইয়া দোলান আছে। অবেণীবদ্ধ কেশগুচ্ছ গুলি ছোট ছোট সর্পের আকারে চারি দিকে যেন ছড়াইয়া গড়াইয়া রহিয়াছে। দরিয়া এইরূপে আসিয়া বলিলেন—"বাজাও হারমনিয়ম, শুন গান।" গানের ভাষা বুঝা গেল না, বুঝা গেল সুর। সে সুর বেহাগ। গান যখন ভরপুর চলিতেছে তখন আবার বাতায়ন পথে হোসেন খাঁর নিস্পন্দ ছবি অঙ্কিত হইল। দরিয়ার দুই চরণে সোনার নূপুর সোনার তোড়া রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু করিয়া বাজিতেছে আর ধামারের তালে তিনি নাচিতেছেন ও গান করিতেছেন। ভারতবর্ষে এমন কোনও পটীয়সী নর্ত্তকী নাই যিনি দরিয়ার নৃত্য কলার শতাংশের এক অংশ অনুকরণ করিতে পারেন। দরিয়া যেন নাচে ও গানে নিজেই বিভোর হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি ছাড়া জগৎ বলিয়া আর কিছু আছে কিনা এ বোধ তাঁহার নাই। আর সুকুমারও বিভোর হইয়া বাজাইতেছেন একবারও দরিয়ার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন না। ওদিকে হোসেন খাঁ সত্যই অনড় অচল পাষাণ প্রতিমার ন্যায় বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষে কেবল দেখিতেছেন।

গান শেষ হইল, নাচও বন্ধ হইল, দরিয়া সুশিক্ষিতা নর্ত্তকীর ন্যায় সমের মুখে হোসেন খাঁকে সেলাম করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

হোসেন খাঁ। তুমি বাঙ্গালিনী সাজিলে কবে হইতে। বাঙ্গালার বাঙ্গালিনী হইলেও মিশরের মাধুরী তুমি ত পরিহার করিতে পার নাই। আমি এই কয়দিন তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। আজ যাহা দেখাইলে তাহা মিশরেও কেহ দেখাইবার নাই। সেলাম বিবি আর আমায় দেখিতে পাইবে না, আমি চলিলাম।

আহতা ফণিনীর ন্যায় যেন ফুলিয়া উঠিয়া ফণি ফনা বিস্তার করিয়া শীৎকারের মুখে দরিয়া কি বলিতে উদ্যত হইলেন। তাহার মাথার অসংখ্য কেশগুচ্ছের ফণি সকল যেন সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু বাতায়ন-পথে হোঁসেন খাঁ আর নাই। বলি বলি করিয়া দরিয়ার কথাটি বলা হইল না। তখন সত্যই প্রহতা ফণিনীর ন্যায় একটু যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া দরিয়া বলিলেন,—"কে এ? এ কি সেই? সে যদি হবে ত এখানে কেন?" এই বলিয়া দরিয়া দুই হাত তুলিয়া চোক মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সুকুমারের ক্রোড়ে আসিয়া বসিলেন এবং বাম হস্ত তাঁহার গলার উপর দিয়া মাথাটি একটু চিৎ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"এইবার আমি হারিয়াছি। স্বামী তুমি, গুরু তুমি, তুমি আমায় রক্ষা কর।" তাহার পর গুণ গুণ স্বরে কীর্ত্তনের সুর ধরিয়া উদাস কাতর সুর তুলিয়া তিনি গান ধরিলেন—

মনে পড়িল রে আমার সেই ব্রজভূমি—

এই একটা কলি গান করিতে করিতে দরিয়ার দুই নয়ন উছলিয়া দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সে রোদন যেন আর থামে না, অনেকক্ষণ পরে সুকুমার বলিলেন, "বুঝিলে দরিয়া! যঃ পলায়তে স জীবতি, এই উক্তিটা কত সত্য।"

দরিয়া। বুঝিলে সুকুমার! বাবাজীর কথাটাও কত সত্য,—আগুণ লইয়া খেলা করিতে নাই। কিন্তু আমি করি কি? ও দিকে যে সুকুমারী আছে, আর গুরুদেব আছেন। এই সময়ে মরণটা বড় সুখময় বলিয়া মনে হয়। মরিতে দিবে কি?

শুষ্ককণ্ঠে সুকুমার বলিলেন, 'না' এবং দরিয়াকে শিশুর ন্যায় কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

(২)

সুকুমার সে বাটী ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছেন। সাহেবপাড়ার পার্শ্বেই একটা ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া আছেন। এ বাড়ী হইতে গঙ্গা দূর নহে, কালীঘাটও দূর নহে। বাড়ীর চারি দিকে দুই তিন বিঘা জমী আছে। বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিবারও কেহ নাই। আজ কয়দিন হইতে হোসেন খাঁরও কোনও খবর পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বাসার লোকে জানে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। মাসেক কাল পরে করাচী হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিবেন। হোসেন খাঁ যে কে তাহার কোনও পরিচয়ই বাসার কেহই বলিতে পারিল না। এদিকে দরিয়াও আজ কয়দিন হইতে অন্যমনা হইয়াছে আছে। সুকুমার একটা বড় দায়রার মামলায় বিব্রত, তাহাতে টাকা অনেক, পরিশ্রমও অত্যধিক। তিনিও দরিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছেন না।

দরিয়া আপন মনে কি বকেন, কি বলেন কিছুরই ঠিক নাই। দুইদিন ঝোঁকের মুখে লোকজন পাঠাইয়া বাবাজীর খোঁজ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনও খবরই পান নাই। দরিয়ার সাজ পোষাকে আঁট নাই, নাচ গানে স্ফূর্ত্তি নাই, এমনকি পান ভোজনেও মনোযোগ নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া দরিয়া কাশীতে এক টেলিগ্রাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীকে একখানা চিঠি লিখিলেন। তাহাতে এই কটি ছত্র লিখিয়া ছিলেন—"এ কর্ম্ম আমার নহে। তোমাদের সামগ্রী তোমরা আসিয়া বুঝিয়া লও। আমি একে মুসলমানী

তায় অনভিজ্ঞা যুবতী। তবে একটা কথা ভুলি নাই যে আমি হুকুমের দাসী, তাই আজ পর্য্যন্ত হুকুম অমান্য করি নাই। কিন্তু আর বুঝি সে সঙ্কল্প স্থির থাকে না, পশ্চিম দিকে একটা কাল মেঘ উঠিয়াছে। সে মেঘ দরশনে দরিয়ার বক্ষ কেবল উথলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। হয় কূল ভাঙ্গিবে নহে ত দুকূল উপচাইয়া দরিয়া প্লাবন তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে। পারত এই বেলা এস। না আসিলে জানিও, 'পড়িয়ে ভব সাগরে ডোবে মা তনু এ তরী।' এ ছোট ডিঙ্গা ফাঁসিলে আমি কিন্তু দায়ী নহি। নারীই নারীর গতি—এস দিদি তোমার বহিনকে রক্ষা কর।"

পত্র ও টেলিগ্রাম পৌঁছিবার পর কাশীর বাড়ীতে অনেক আলোচনা হইয়া শেষে সুকুমারীই আসিবেন ইহাই স্থির হইল। একদিন সকালে একখানি গাড়ি গড় গড় করিয়া সুকুমারের বাটীর সম্মুখে আসিল, হাতা পার হইয়া গাড়িবারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। আর সেই গাড়ি হইতে নামিলেন স্থির বিজলী একটি রূপের প্রতিমা,—বিগলিত কাঞ্চন যেন ঢালিয়া দিয়াছে, লাবণ্যের আঁধারে যেন শত চাঁদ নিঙড়াইয়া মাধুরীকে কাণে কাণ ভরপূর করিয়া রাখা হইয়াছে। রূপ এত অগাধ এত অপরিমেয় যে উপরে ক্ষুদ্র বিচীবল্লরীর খেলা নাই—প্রশান্ত প্রবীন, ও প্রকৃষ্ট—প্রকৃষ্ট বলিয়া যেন নিত্য প্রসন্ন। রূপময়ী নামিলেন সঙ্গে সঙ্গে বালারুণতুল্য নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময় একটি কিশোর বালকও নামিল। গণেশজননী যেন হেরম্বের হাত ধরিয়া গৃহে আসিয়া উদিত হইলেন। দরিয়া গাড়ির শব্দ শুনিয়াই নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, সুকুমারও মক্কেল ছাড়িয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দ্বাদশ বৎসরের কিশোর নন্দ বাবাকে চিনিয়াই কোলে উঠিল, যেন ধবলগিরির বক্ষে বালেন্দুর প্রতিকৃতি সহসা

ফুটিয়া উঠিল। সুকুমারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে টীপ করিয়া স্বামীকে একটী প্রণাম করিলেন। তখন সত্যই যেন মনে হইল বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা স্বাবয়বা হইয়াছে। দরিয়া এ দৃশ্য দেখিলেন, শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুকুমারীর হাত ধরিয়া বলিলেন, চল দিদি উপরে যাই। ঊষা ও সন্ধ্যা যেন সম্মিলিত হইয়া উপরে উঠিলেন। নন্দও বাপের কোল হইতে নামিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া উপরে গেল।

দরিয়া তাঁহাদের বসাইয়া বলিলেন, নারী যখন জননী,—বিষ্ণুপাদোদ্ভবা রুদ্রজটা বিহারিণী গঙ্গা—পতিতপাবনী ত্রিলোকতারিণী। আর নারী যখন রমণী, আলেয়ার আলো জলাশয়-উত্থিতা বটে, পরন্তু নিত্য উত্তাপময়ী। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রমধ্যস্থ রূপ বিন্দুমাত্র; না দেখলে কি বোঝা যায় দেখার সাধ মিটাইয়াছ বলিয়াই আজ এইটুকু শিখিয়া লইলাম। বস মা, তোমার ঘর আলো করিয়া বস। দরিয়া পাতকিনীর মত কুল কুল কল কল উদাসধ্বনি করিতে করিতে নৈরাশ্যের মহামরুতে মিশাইয়া যাউক।

সুকুমারী। ছি! পাগলের মত কি বকিতেছ। আর একখানা গাড়ি আনিয়া দাও, মায়পোয়ে গঙ্গা স্নান করিয়া দেবী দর্শন করিয়া আসি, তাহার পর কথা বলাবলি হইবে।

(৩)

সুকুমারী পুত্র লইয়া গঙ্গা স্নানে গেলেন, দরিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সত্যই দরিয়া সুকুমারকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিত। দরিয়ার যত্নে ও সেবায় সুকুমার তুষ্ট ছিলেন, তুষ্ট শুধু বলি কেন, সুকুমারের ভাগ্যে এত সুখ এত সুবিধা জীবনে ইহার পূর্ব্বে আর

ঘটে নাই। দরিয়া পূর্ণ যুবতী, ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত টলটল, ছলছল, করিতেছে। শুধু যুবতী বলিলেই হয় না, দরিয়া অসামান্যা রূপবতী। তেমন রূপ বুঝি বাঙ্গালীর ঘরে দেখা যায় না, নূতন পুঁইডগার মত, চাঁছা বাখারীর মত, অশ্বথের নূতন পাতার মত দরিয়া নিজের রূপলাবণ্যে অহরহ কাঁপিতেছিল নাচিতেছিল আর সেই নর্ত্তন কুর্দ্দনে কত অপূর্ব্ব মাধুরীর ছটা বিকাশ করিতেছিল। কিন্তু দরিয়া নিজেই বলিয়া রাখিয়াছে 'আমি বাঁদী হুকুমের দাসী', সে কথা দরিয়া ভুলিতে পারিত না। কেবল তাহাই নহে দরিয়ার গুরুবাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, এই কয়েকমাস কাল দরিয়া ও সুকুমার একত্রে বাস করিয়াছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই কখনই এক-দিনের জন্য বেচাল বা বদচাল হয় নাই।

দরিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, আর আপন মনে বলিতেছে—"ছাই রূপ! এ আবার রূপ, রূপ সুকুমারীর। আচ্ছা অমনটিত আমাদের দেশে হয় না, আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই না। একি দেশ ভেদে রূপের প্রকৃতিভেদ ঘটে! যাউক—এ ছাই রূপ! যার অমন পত্নী তার সঙ্গে সত্যই রূপ লইয়া খেলা করিতে নাই, সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া ছিলাম আর কি। ভাগ্যে ঘটে বুদ্ধি আসিল তাই টেলিগ্রাম করিলাম, চিঠি লিখিলাম। আমি ভেবেছিলাম স্বামীজী আসবেন,এবার স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকরুণ হাজির, ইহাও একটা প্রহেলিকা। কি করি? কিছুই ত ঠাওর করিতে পারিতেছি না। আমি বৈষ্ণবী ত সাজিতে পারিলাম না, মুসলমানীও থাকিতে পারিলাম না, আমার একূল গেল, ওকূল গেল, এদের ছেড়ে পালাব নাকি? দেখা যাক অবস্থা কি দাঁড়ায়, আমার হাতেই ত সব।" এমন সময় সুকুমারী ও তাঁহার তনয় গঙ্গা স্নান ও কালী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সুকুমারী রক্তাম্বর-

ধারিণী, একখানি লাল বেনারসী চেলী পরিয়াছেন, পুত্র নন্দও লাল বেনারসী জোড় পরিয়াছে, উভয়েরই মাথায় সিন্দূরের টিপ, গলায় মালা হাতে প্রসাদ। সুকুমারী দরিয়ার মুখভঙ্গী দেখিবামাত্রই সব বুঝিলেন এবং তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"পাগলী ভাবছিস্ কি, শাস্ত্রে আছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" আমার শ্বশুর কুলের জলপিণ্ড রক্ষা হইয়াছে। বিশ্বনাথের কৃপায় নন্দ আমার দীর্ঘজীবী হইবে স্বামীজির অধীনে সুশিক্ষাই পাইতেছে, আমার সংসারের কাজ আমি করিয়াছি। আমার সামাজিক কর্ত্তব্য পালন হইয়াছে, আমার জন্য তুই ভাবিস্ কেন? আমি ত ভাবি না। ভাবিলে আমারইত সব, আমিই সর্ব্বময়ী তোকে দখল দিব কেন? কিন্তু তাত নয় সংসারে দেহটা লইয়া কেবল কর্ত্তব্যই পালন করিতে হয়। আমার ওখেলা শেষ হইয়াছে, অন্যখেলা খেলিতে হইতেছে। তুই ভাবিস্ না। ঠাকুর আমায় অনেক কথা বলিয়া দিয়াছেন। আহারাদির পর বিশ্রাম লইয়া সব কথা বলিব। যাও স্নান করগে, আমরা মায়পোয়ে পূজায় বসিব।

এমন সময় নন্দ বলিল,—হ্যাঁ মা এই ত আমার দরিয়া মামী?

সুকুমারী। হাঁা বাবা। তোমার মামীই বটেন। তুমি মা বলিলেও বলিতে পার। ছোট মা বলিয়া ডাকিও।

এমন সময়ে সুকুমার উঠিয়া আসিলেন, স্নানান্তে তোয়ালে দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে হাজির,— নন্দ ঝাঁপাইয়া গিয়া বাপের কোলে উঠিল এবং বলিল বাবা আমি কলিকাতাটা সব দেখিয়া তবে কাশী যাইব।

সুকুমার। দেখিবে বইকি বাবা। এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে কাজ নাই। আমি যখন বলব তখন যেও। তোমার এখন লেখাপড়া কি হচ্ছে?

নন্দ। আমি অষ্টধ্যায়ী শেষ করিয়াছি, অমরকোষও আমার শেষ হইয়াছে, অলঙ্কার ও কাব্য পড়িতেছি আর সঙ্গে সঙ্গে একটু ইংরাজিও শিখিতেছি।

সুকুমার। বেশ! বেশ! স্বামীজি যা শিখাবেন তাই শিখবে। আমি এখন খেয়ে আফিস যাই। ওবেলা এসে তোমাকে কলিকাতা দেখতে নিয়ে যাব।

এই বলিয়া সুকুমারীর প্রতি একটি স্থির ধীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সুকুমার কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী ও নন্দ অন্য কক্ষে গেল। দরিয়া সেই মুক্ত কক্ষকুট্টিমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল এবং কাতরস্বরে, কখনও বা করযোড়ে কখনও বা মার্ব্বেলের মেজের উপর মাথা কুটিয়া, বলিতে লাগিল—"কোথায় তুমি দুর্ব্বলের বল অগতির গতি পতিত পাবন হরি—বালিকাকে এইবার রক্ষা কর। শুনিয়াছি তুমিই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুরুষস্বরূপ, নারীর লজ্জা নিবারণ তুমিই করিতে পার, তুমিই করিয়াছ। দর্পহারী মধুসূদন আমার দর্প হরণ করিয়াছ, এখন আমায় রক্ষা কর।" এইরূপে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া দরিয়া প্রার্থনা করিল। শেষে চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বেলা দ্বিপ্রহর কাটিয়াছে। নন্দ আহারাদি করিয়া ঘুমাইতেছে। ট্রেণে তাহার তিলমাত্র ঘুম হয় নাই। জীবনে সজ্ঞানে এই তাহার প্রথম ট্রেণে আরোহণ, তাই কেবল দেখিয়াছে আর কামরায় নাচিয়া বেড়াইয়াছে। সুকুমারী ও বিনিদ্র রজনী অতিবাহন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আহারাদি করিয়া না ঘুমাইয়া দরিয়ার কক্ষে আসিলেন, তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন এবং তাহাকে কাছে বসাইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে

লাগিলেন। দরিয়া কিছুই গোপন করিল না, শেষে উদাসভাবে বলিল, দিদি বুঝি বা বালির বাঁধ আর টিকে না, অনেক কাঁদিলাম কাটিলাম প্রার্থনা করিলাম কিন্তু যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহা আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না, কি কর্ব্ব দিদি!

সুকুমারী। যা করবে তাই বলতে এসেছি। বালির বাঁধে পদ্মার স্রোত আটকান যায় না। যত উল্টা চেষ্টা করিবি ততই মরিবি। ওর ওষুধ যা তা আমি বলে দিচ্ছি শোন। নারী আর নদী দুই এক, কূল না ভাঙ্গিলে নদীগর্ভও ঠিক হয় না, নারীর পত্তিও ঠিক হয় না, কূল ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। নারী যতদিন রমণী ততদিন অস্থিরা, চঞ্চলা, চপলা, তরঙ্গভঙ্গ-ব্যাকুলা, নারী যে দিন জননী হন সেই দিনই মানস সরোবরের ন্যায় স্থিরা ধীরা গম্ভীরা হইয়া পড়েন। তুমি এখনও রমণী—ভামিনি, কামিনী, তোমাকে সামলায় কাহার সাধ্য। বিধাতার গড়া এমন পাথর নাই যাহা দিয়া বাঁধ করিলে তোমার এই প্রেমের উত্তাল তরঙ্গিনীকে আবদ্ধ করা চলে। সহজ মতে নারী কখনই জননী হন না, নারী জননী হইলেই তন্ত্রের অধিকার ভুক্তা হইলেন! গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এতদিন যে খেলা খেলিয়াছ তাহা বেশই খেলিয়াছ, এখন যাহা বাকী আছে সেটুকু মক্স করিয়া লইতে হইবে! আমি সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। এস তোমায় সাজাইয়া দিই, তোমাকে নূতন ব্রতে দীক্ষিত করি।

দরিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সুকুমারীর মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধা ফণিনীর ন্যায় নির্ণিমেষ নয়নে কেবল তাকাইয়াই রহিল। দুই হাত গৃহ কুটিমের উপর ন্যস্ত করিয়া সেই বাহু-যুগলের উপর সর্ব্বাঙ্গের ভার দিয়া ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়াই রহিল।

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—কে মা তুমি? আমিত নারীর মুখে এমন কথা শুনি নাই। আমি তোমার স্থানে হইলে হিংসার ফণা বিস্তার করিয়া নিশ্চয়ই দংশন করিতাম। কে মা তুমি! কিন্তু তোমার কথা শুনিতে আমি পারিব না, তাহাতে দুইটি বড় বাধা আছে। প্রথম কথা আমার প্রেমের অঙ্গনে আমিই সর্ব্বময়ী হইয়া থাকতে চাই, তুমি যে একটা বড় অংশীদার আছ এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। দ্বিতীয় বাধা তুমি ছেলের মা, তোমাকে আমি বেদখল করি কোন হিসাবে। বেদখল করিবার শক্তিও আমাতে কম, তোমার রূপে আর আমার রূপে তুলনা সম্ভবে না, সত্যই তুমি রূপের সাগর। নারী আমি যতই তোমাকে নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছি ততই ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপের বিভা তোমার কান্তি হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। না জানি নরের দৃষ্টিতে তুমি কেমন! তাহার উপর সুকুমারকে আমি চিনি। আমি নারী একটা পুরুষকে লইয়া এত-দিন রহিলাম, আর তাহার হৃদয় খানা খুলিয়া দেখিতে পারিব না? সে পুরুষ তোমারই যোগ্য তোমারই উপযোগী আমি এ রাজ-যোটক ভাঙ্গিতে চাহি না। তাহার উপর আজ আদালতে যাইবার পূর্ব্বে তাহার নয়নে যে দীপ্তি দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়াই বুঝিয়াছি আমার কপাল পুড়িয়াছে। তাই তুমিও যখন পূজা করিতেছিলে আমিও তখন ঘরের মেজের পড়িয়া আহতা ফণিনীর ন্যায় কেবল ছটফট করিয়াছি আর অনাথের নাথকে ডাকিয়াছি। তাহার উপর আমি যাঁহার বাঁদী তাহার মুখের কথা না পাইলে এ সোনার সংসারে আমি আগুন জ্বালিতে পারিব না। দিদি আমায় বিদায় দিতে হইবে, আমি সেই কথা বলিবার জন্যই ডাকিয়া আনিয়াছি।

সুকুমারী। হায় দরিয়া! তুমি যদি বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হইতে,

তুমি যদি ব্রাহ্মণ কুমারী হইতে, তাহা হইলে আমার কথা কয়টা বুঝিতে। আমাদের দৃষ্টিতে স্বামী দেবতা, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা, এমন কি ভগবানের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেবতা। স্বামী নাগর নহেন, স্বামী প্রেমের আধার নহেন, স্বামীর সহিত নাগরালি করিতে নাই। দেবতার ভোগে যেমন সকল পুষ্প লাগান যায় স্বামীর চরণেও তেমনি সকল কুসুমই অর্পণ করা চলে। স্বামীর তুষ্টি তৃপ্তি সাধনই আমাদের ব্রত। তিনি যাহাতে সুখী হন আমরা তাহাতেই সুখী হই। সুতরাং ভাবিও না যে আমি তোমাকে ছেঁদো কথা শুনাইতেছি। আমি অকপট হৃদয়ে সরল প্রাণে, মনে কোনও কাঁটা খোঁচা না রাখিয়া তোমাকে যাহা করিতে বলিতেছিতুমি তাহাই কর।

দরিয়া। কি জানি দিদি তোমাদের চিড়িং চড়াং মন্ত্র তন্ত্রে কি আছে। কয়টা মন্ত্র না পড়িয়া তোমরা স্বামী স্ত্রী সাজিলে এক অপূর্ব্ব রকমের জীব হইয়া দাঁড়াও। আমার ত সে সব বালাই নাই। আমার যে কেবলই প্রেমের খেলা, আমি চাই সবটা গ্রাস করিতে। আমি চাই তিনি ও আমি দুজনে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে। তোমরা স্বামী স্ত্রী পৃথক থাক, স্বামীকে দেবতা বানাইয়া পূজা কর, আমি আমার নাগরকে আমার করিয়া লইতে চাহি। একেবারে খাইয়া ফেলিতে চাহি। সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ব আসক্তি, দেহের সবটাই দিয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিতে চাহি। তখন আর নরনারী বিচার থাকে না। এখেলার মাঝখানে তুমি থাকিলে ত চলিবে না কাজেই পলাইতে হইল। ইহাই ত সহজ ধর্ম্ম। আমি ত ঠাকুরের মুখে এই কথাই শুনিয়াছি, আমার প্রাণত এই কথাই বলিতেছে অন্য উপায় ত নাই দিদি।

সুকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, কোনও কথার উত্তর দিতে

পারিলেন না। কারণ দরিয়া যে চুড়ান্ত কথা কহিয়াছে কতক্ষণ পরে দরিয়া আবার বলিতে লাগিল—

দিদি রূপ হইল নামের বেদীর উপর প্রাণের দান। যতদিন নাম না বুঝিব ততদিন রূপ যৌবন লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিব ইহাই সহজ ধর্ম্ম। প্রাণের খেলা লইয়াই ত সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি। আমি বৈষ্ণবী—আমরা বধুঁয়া আন ঘরে যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া,—এ আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি সোজা সাদা কথা তোমায় বলিব। আমার কর্ত্তব্য কি তাহাও আমি স্থির করিয়াছি। কর্ত্তব্য,—যঃ পলায়তি স জীবতি।

সুকুমারী। বেশ তাই হবে। কিন্তু যাকে লইয়া এত গোলমাল চলিতেছে তাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিবে না। যিনি পুরুষ, যিনি নামের আধার একবার তাহার দিকে তাকাইবে না? তিনি আসুন তাহাকে সকল কথা আমি বলিব, না হয় তুমিই বল। তাহার পর তিনি কি বলেন শুনিয়া শেষে যাহা ভাল হয় তাহা করা যাইবে।

দরিয়া। দূর খ্যাপা মাগী! যাহা মেয়ে মানুষের কাছে বলা চলে তাহা কি পুরুষকে বলা যায়? পুরুষের সহিত চোখে চোখে ভাষা চালাইতে হয়। তাহাদিগকে কোনও কথা খুলিয়া বলিতে নাই। আমি যাহা বলিব বা তুমি যাহা বলিবে তাহা কি তিনি জানেন না? জানেন সব। যখন জানেন তখন ধরা দিই কেন? জানা শুনার পরও তোমার উপর সেই দৃষ্টি। আর কি কোনও কথা বলিতে আছে।

সুকুমারী মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। ব্যাতাবিক্ষুব্ধ কহ্লারের মত মুখ হেঁট করিয়া—রক্তিমাভ মুখখানিকে কবরীর কৃষ্ণাভায় যেন ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

(৪)

সেদিন সুকুমার চারিটা বাজিতে না বাজিতেই আদালত হইতে বাড়ী আসিলেন তাড়াতাড়ি ধড়াচুড়া ছাড়িয়া স্নানাদি করিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন এবং নন্দকে সাজাইয়া গোজাইয়া কলিকাতা পরিদর্শনে বাহির হইলেন। তখন আর কোনও কথা হইল না। দরিয়া নিঃশব্দে সুকুমারীর ঘরে আসিয়া আবার বসিল এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দিদি এইবার এ যমুনা গঙ্গা সংস্পর্শে শ্বেতকায়া হইলেন তাঁহার কালরূপ কালিন্দী নাম সবই জাহ্নবীর বালিতে ডুবিয়া মিশিয়া গেল। কর্ত্তা জনকের ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছেন, গঙ্গার স্নেহ তরঙ্গ আসিয়া প্রেম যমুনাকে নিশ্চিহ্ন করিতেছে, আর রক্ষা নাই আমায় বিদায় দাও।

সুকুমারী। তুই যে একেবারে পণ্ডিত হয়ে উঠিলি লো। বাৎসল্যভাব অদম্য। উহা সকল হৃদয়েই আছে। তোর কোলে একটি ছেলে হলে তুইও অমনি হবি। যমুনা গুপ্ত হইলেও আবার ব্যক্ত হন। ব্যক্ত ত্রিবেণীর কথা শুনিস্ নি? মুক্ত বেণীর কথা জানিস্ না। এই কলিকাতার উত্তরেই আছে চলনা একদিন যাই দেখিয়া আসি।

দরিয়া। আমি দেখেছি! যমুনার প্রকটভাব একেবারেই নাই একটা খালে পরিণত হইয়াছে। সরস্বতী নামে মাত্র আছে। আর ভাগীরথী প্রবল প্রবাহে চলিয়াছে মুক্ত বেণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া কাজ নাই। এখন দেখিলে আমি হয়ত আত্মহত্যাই করিয়া বসিব।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
যার বিশাল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি॥

দরিয়া এই গানটা ভাল করিয়াই গাহিল। গদগদ কণ্ঠে সাশ্রুনয়নে গাহিল, গানও শেষ হইল পশ্চিম গগনে সূর্য্যও ডুবিলেন সুকুমার ও নন্দ, পিতা ও পুত্র ঘরে আসিলেন। সুকুমার আসিয়াই বলিলেন, "বেশ গান চলছিল বন্ধ হল কেন ?"

সুকুমার। আমরা হিন্দু জীবনটাকে কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছি বটে। সামান্য মিষ্টান্নের নামটাও সন্দেশ রাখিয়াছি। আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওটাকে তত্ত্ব বলিয়া থাকি। প্রত্যেক কথায় গৃহস্থালীর প্রত্যেক কর্ম্মে আমরা কাব্য ছড়াইয়া থাকি কিন্তু এতটা কাব্যের জন্য আমি প্রস্তুত নহি। আমার সত্যই কাব্যে একটু অরুচি হইয়াছে। আমার ছেলে আমার পরিবার—এমন ছেলে এমন পত্নী, আমি তাদের ছেড়ে শুষ্ক কবি হইয়া আর জীবন যাপন করিতে চাহি না। এখন সোজাসুজী গৃহস্থ হইব।

দরিয়া। শুনিলে দিদি ? পর্ব্বতের পাষাণ-পঞ্জর ভেদ করিয়া যেমন প্রস্রবনের জল বাহির হয় পিতৃত্ব ও বাৎসল্য তেমনি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এ সাফ্ গঙ্গোত্রী, যমুনার উজান গতি এখানে চলিবে না। চালাইতে গেলে ত যমুনাকেই ডুবিয়া মরিতে হইবে। তাই যমুনা ব্রজমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রজের রজ বুকে করিয়া দূরে বহুদূরে তোমাদের হিন্দুরাণীর অধর বটের মূল দেশে যাইয়া জাহ্নবী অঙ্গে নীল তনু ডুবাইয়াছেন। আমার ব্রজের সাধ শ্রবণও আছে, আমাকে একটু ঘুরিতে ফিরিতে হইবে।

সুকুমার। যাঃ পাগলী, পাগলের মত কি বকচিস্। আয় নন্দর পোষাক খুলে দিবি আয়।

দরিয়া চক্ষের জল মুছিয়া নন্দের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। শব্দ

হয় নাই বটে, কিন্তু বাৎসল্য ভাবের দ্যোতক "যাঃ পাগলী" এই বাণী শুনিয়া মড় মড় করিয়া দরিয়ার বত্রিশ পঞ্জর ফাটিয়া গিয়াছিল।

এমন সময় খঞ্জনীর অপূর্ব্ব নিক্কনের সহিত বৃদ্ধ বাবাজীর সাধা কণ্ঠে পঞ্চম তান গাড়ি বারেন্দা ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। বাবাজী সেই পুরাতন গানটিই ধরিয়াছিলেন—

রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হল।

সে গান শুনিয়া নন্দ কোট পেণ্ট্‌লুন ছাড়িতে ছাড়িতে অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় দরিয়ার হাত ধরিয়া নীচে নামিল। বাবাজী গান শেষ করিয়া একটু মুচ্‌কী হাঁসি হাঁসিয়া দরিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ ছেলেটি কে মা?"

দরিয়া। আমার বোন পো।

বাবাজী। ছিঃ মা। ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে না।

দরিয়া। ছেলেত বটেই তবে আমার পেটের ছেলে নয়।

বাবাজী। দূর পাগলী! পেটের ছেলে হলেই কি ছেলে হয়?

মা হওয়া নয় কথার কথা।

শুধু প্রসব করলে হয় না মাতা॥

এটুকুও বোঝনি মা? এখনও অনেক দেরী!

দরিয়া। তা জানি। দেরীর কাজটা শীগ্‌গির সেরে নেবো বলেই একবার অভিসারে বাহির হইব, সঙ্গে লইবে কি? মহাবনে যাইব। পারিবে?

বাবাজী। জগৎ মনুষ্যারণ্য। মনুষ্যারণ্যেই মহাবন, যতদিন পিঞ্জরের মধ্যে পাখী থাকবে ততদিন সাথী হব। যাও ত বিলম্ব করিও না। আবার আসিব। এই বলিয়া বাবাজী মাথুরের সেই গানটি ধরিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

ঐ সে মাধবীতলে আমার মাধব লুকায়ে ছিল।

নন্দ তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল এবং মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়া কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিল। মা মাসী কোথায় যাচ্ছে? একটা বাবাজী বেশ গান করে তার সঙ্গে কি কথা বললে।

সে রাত্রে সুকুমারের বাড়িতে কড়া পাহারা পাড়ার চারি দিকে লোক মোতায়েন রহিল, পাছে দরিয়া পালায় তাই এই আয়োজন, কিন্তু অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় কালে সহসা সুকুমারীর কর্ণে এই গীত ধ্বনিত হইল—

এক ভাবির কাছে ভাব পেয়েছি আরকি লজ্জার বাঁধ রেখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক মানুষ পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা রাত্র নাম রূপের সাধ নিয়েছি।
হারা কার ছেড়ে দিয়ে এ জীবনকে বন্ধ্যা করেছি॥

তাড়াতাড়ি সুকুমারী উঠিলেন। আলুলায়িত কেশে, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দরিয়ার কক্ষে ঢুকিলেন—দরিয়া নাই। কোনও কক্ষেই নাই, একতলে, দ্বিতলে নাই। পাতি পাতি করিয়া হাতা খোঁজা হইল কোনও খানে তাহাকে পাওয়া গেল না। সুকুমার ছুটিয়া বাহিরে গেলেন কত দৌড়া-দৌড়ি করিলেন দশদিকে লোক পাঠাইলেন। দরিয়াকে পাওয়া গেল না। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে সুকুমার নিজের কক্ষে আসিয়া সোফার উপর মুখ গুজড়াইয়া পড়িয়া অনবরত অবিশ্রান্ত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারী তখন করজোড়ে ঊর্দ্ধ নেত্র হইয়া বলিলেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক দয়াময় কিন্তু এ যে নূতন রোগ উপস্থিত হইল। যখন পাখী সোনার পিঁজরে আটক ছিল ততদিন শান্তি ও স্বস্তি ছিল। এখন যে উদ্গার মুখে গঙ্গার জল ভেদ করিয়া যমুনার প্রবাহ আবার ঠেলিয়া

উঠিল। এ রূপের বেলায়, এ প্রেমের লীলায় ক্ষুদ্র নারী আমি আছাড় খাইয়া শুষ্ক বেলাভূমির উপর পড়িলাম। আমার এ জীবনটা কি কেবল শুষ্ক বালুকাময়ই হইয়া থাকিবে? আমার এরূপ যৌবন কেবল কি কেতকী পরাগের মত শুষ্ক হইয়া থাকিবে। ছিলাম ত বেশ জননী হইয়া শ্বশুর বংশের কল্পতরুকে মানুষ করিতে ছিলাম, এ আবার চোখের দেখা দেখাইয়া নূতন তরঙ্গ তুলিলে কেন? কোথায় গুরুদেব কোথায় তুমি?

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

যশোরের দক্ষিণে ইচ্ছামতী নদীর তটে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম। গ্রাম অতি ক্ষুদ্র, পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস আছে কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণ কায়স্থ উচ্চ জাতীয় বড় কেহ নাই, কয়েক ঘর কান আছে বা কিন্নর জাতীয় বাঙ্গালী আছে বাকী সব চাষী কৈবর্ত্ত এবং গ্রামের পার্শ্বে একটু স্বতন্ত্র ভাবে কয়েক ঘর মুসলমান আছে। ইচ্ছামতীর বাঁকের মুখেই এই গ্রাম, নদীর উপরেই ঘন বাঁশবন, নদী হইতে বুঝা যায় না যে এই বাঁশ বনের অন্তরালে একখানি সুন্দর গ্রাম আছে। গ্রামে পাকা ঘর দুয়ার নাই, সবই

মাটির ঘর, এমন কি একখানি ইটও কোনও খানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলই কি তাই? জলপানের টুকনী ছাড়া গ্রামের কোনও গৃহস্থের বাটী, পিতল, কাঁশা বা লোহের তৈজশপত্র কিছুই নাই, কিন্তু গ্রামটি তকতকে ঝকঝকে, কোনওখানে একটু ময়লা বা আবর্জ্জনা নাই, প্রত্যেক গৃহ প্রাঙ্গনই নিত্য গোময় লিপ্ত হয় তাই গৃহশ্রীও সুন্দর, প্রত্যেক প্রাঙ্গনেই তুলসীমঞ্চ আর সেই তুলসীমঞ্চের নীচেই একটি করিয়া ঘৃতের প্রদীপ। গ্রামটি বৈষ্ণব প্রধান, গ্রামের মধ্যস্থলে আখ্ড়া বাড়ি বা স্বরূপ-দাস বাবাজীর আস্তানা। স্বরূপদাস কিন্নর জাতীয়, ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে আর জাতীর পরিচয় দেয় না। স্বরূপদাস দীর্ঘকায় পুরুষ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দাড়িগোঁফ প্রচুর আছে, মাথায় কেশরীর কেশরের মত চুলগুলি ঢেউ খেলিয়া স্কন্ধের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সেই কেশরাশির মধ্যে একগুচ্ছ কেশে একটি টিকি বাঁধা আছে, আর টিকির শেষে চুলের ওপর একটি অতি ক্ষুদ্র তাঁবার মাদুলী বাঁধা আছে। বাবাজীর গলায়, খুব মোটা মোটা তিননালী তুলসীর মালা কলারের মত কণ্ঠটি বেড়িয়া আছে। বাবাজীর দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চক্ষু, বিস্তারিত বক্ষ আর সেই বক্ষের মধ্যে প্রচুর লোম আর তাহার উপর লহরে লহরে নানা রকম তুলসী ও পদ্মের মালা ঝুলিয়া আছে। পরিধানে ডোর কৌপিন তাহার উপর বহির্ব্বাস, কাঁধে একখানা গামছা, আর হাতে বাঁশের লাঠি। বাবাজীকে দেখিলেই মনে হয় খুব সুস্থ সবলকায় পুরুষ, লাঠিখেলা টেলাও জানা আছে এবং নানা তীর্থও তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন।

স্বরূপদাসের আস্তানায়, অনেকগুলি বৈষ্ণব বাবাজীর আস্তানা। তাহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের চারিধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে বাবাজী যেন ছড়ান রহিয়াছে

কেহ বা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া মড়ার ন্যায় পড়িয়া আছে, কেহ বা উচু হইয়া বসিয়া, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটি গুঁজিয়া নীরবে জপ করিতেছে, আর কেহ বা বৈষ্ণবীকে পার্শ্বে বসাইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া নামগান করিতেছে। বাবাজী সকলের তত্ত্বাবধায়ক। বাবাজী নিজেও সুগায়ক এবং ভাবুক। এই গ্রামেরই একটু দূরে মধুকাণের বাড়ি, মধু মাঝে মাঝে বাবাজীর আড্ডায় আসে তখন খুব গান চলে, বাহির হইতেই দেখিলেই মনে হয়, স্বরূপদাসের আস্তানা আনন্দের নিকেতন, মাধবীলতাবিতান আছে, মালঞ্চ আছে, শেফালীর সারি আছে। চারিটি বকুল গাছও চারিদিক রক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আর এই পুষ্প বৃক্ষ সকলের লতা মণ্ডপ সকলের চারি পার্শ্বে যেন আঁকিয়া বাঁকিয়া শৃঙ্খলাকৃতি ভাবে ছোট ছোট খড়ের ঘর, বেতের বেড়া দিয়া তৈয়ারী, আর প্রত্যেক ঘরেই বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর স্থান। গ্রামের অনেকেই বলেন স্বরূপদাসের আস্তানায় কখন কত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী থাকে তাহা কেহ বলিতে পারে না, উহা যেন গোলকধাঁধা। স্বরূপদাস হাঁসিয়া বলিতেন, দূর পাগল আমার আস্তানা গোলকধাধা নয়, গোলকধাম।

স্বরূপদাসের আর একটা গুণ ছিল, তাহার গোটা কয়েক "সন্ধাই" ছিল তাহার উপর তিনি সুচিকিৎসক ছিলেন, অনেক জড়িবুটি জানিতেন অনেক গাছ গাছড়া চিনিতেন ইহার জন্য স্বরূপদাসের ঐ তল্লাটে খুব সুনাম ও প্রসার প্রতিপত্তি ছিল। তবে স্বরূপদাসের একটা বড় পণ ছিল তিনি রোগ আরাম করিতে পারিলেই রোগীকে বৈষ্ণব বানাইয়া দিতেন আর ব্রাহ্মণের চিকিৎসা কখনও করিতেন না। এই সকল নানা কারণে স্বরূপদাসের আস্তানা যশোর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে

একটা বড় আস্তানা বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং নানা দিগদেশ হইতে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর দল স্বরূপদাসের আখড়ায় আসিয়া বড় বড় পর্ব্বোপলক্ষে জমায়েৎ হইত।

স্বরূপদাস, কিন্তু এ কাথাটা সহজেও কাহাকেও জানিতে দিতেন না, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ব্যতীত এ তত্ত্ব জানিত না, তবে প্রকাশ্যে তাঁহার আখড়ায় সুন্দর রূপেই পূজা আরতি হইত এবং কৃষ্ণ কীর্ত্তন চলিত। প্রধানতঃ মধুকানের "ঢবের" প্রচলন অধিক ছিল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে এমন সময় স্বরূপদাস নিজের কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি যুবক রোগীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, দেখ ত রূপ ভগবানের নৌকা ঘাটে লাগিল কিনা!

রূপ। আজত তাঁহারা সবাই এসেছেন।

স্বরূপ। বেশ বেশ, তাহাদের পাছদুয়ারে আড্ডা দিস্।

রূপচাঁদ বত্রিশ পাটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "আজ্ঞে তাই দিইচি।

স্বরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া লাঠিটি লইলেন, খড়ম জোড়াটি পায় দিলেন, এবং একটা পদ্মবীজের মালা হাতে করিয়া রূপচাঁদকে ইঙ্গিত করিলেন আমার সঙ্গে এস। উভয়ে নীরবে চলিলেন, আখড়া পার হইয়া সেই বাঁশ বনের ভিতর কতকদূর যাইয়া অতি নিভৃত ও প্রচ্ছন্ন স্থানে দুইটি কুটীরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। স্থানটি অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, নিত্যচ্ছায়া সমাবৃত এবং বায়ুস্পর্শে মনে হইল নদীতটও সন্নিকট কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই যে নদী এত কাছে। সে দিকে বাঁশ বনের সারি একেবারেই দুর্ভেদ্য। "জয় রাধে গোবিন্দ! এসেছ মা এসেছ বাবা।"

এই স্বর শুনিয়াই আমাদের সেই কলিকাতার পরিচিত কোটরগত চক্ষু বাবাজী বাহির হইয়া আসিলেন, আসিয়াই হাস্যমুখে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। স্বরূপদাস যেন কত সোহাগ করিয়া দক্ষিণ চরণ খড়ম হইতে তুলিয়া সেই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহার মস্তকের ব্রহ্মতালুতে স্পর্শ করিয়া দিলেন। ভগবান দাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত জোড় করিয়া বলিলেন একবার দেখুন, কেমন সামগ্রী আনিয়াছি, নাচে, গানে, ভাবে, রসে ভরপুর তাহার উপর অনাঘ্রাত কুসুম, এইবার আপনি সওদণ্ডী হইবেন।

স্বরূপদাস আনন্দগদগদ চিত্তে আবার মালাসমেত দক্ষিণ হস্তটি তুলিয়া ভগবানের মাথায় স্পর্শ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—ভাল, ভাল, ভগবান ভাল। এইবার তুমি অন্তরঙ্গের মজলিসে বসিতে পারিবে, তোমাকে সন্ধ্যা ভাষাও শিখাইব এবং অন্তরের কথাও বুঝাইব। আর তোমাকে কলিকাতায় থাকিতে হইবে না।

ভগবানদাস এই কথা শুনিয়া যেন গলিয়া গেল সে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং উঠিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং "এস গুরুদর্শন করিবে" এই কথা বলিয়া কাহার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইল। সেই সময় বংশপত্রের ছায়া ভেদ করিয়া একটি সূর্য্য কিরণ সেইখানে আসিয়া পড়িল, সেই কিরণ পথে যেন গলা সোনা আসিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল আর সেই সুবর্ণদ্যুতির মধ্যে দরিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহার মস্তকের ঘনকৃষ্ণ কেশ রাশির উপর গলা সোনা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার কৃষ্ণতার নয়ন দুটির উপর দিয়া কনকদ্যুতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। নাসিকাগ্র হেমাভ, সুডোল, কপোল দুইটিতে কে যেন সোনা মাজিয়া দিয়াছে আর অধরের পাশ দিয়া প্রথম প্রভাতের শিশির বিন্দুর ন্যায় যেন

হেমকণা সকল ঝরিয়া পড়িতেছে। সূর্য্যের সুবর্ণদ্যুতিতে সেই ছায়াময় স্থানে, নিত্য শীতল, নিত্য স্নিগ্ধ কোমল তমসাবৃত বাঁশ বনে দরিয়া আমাদের দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সমুদ্ভাষিত হইয়া কণক প্রতিমায় পরিণত হইলেন।

স্বরূপদাস কেবল দেখিতেই লাগিল, এমনটিত সে কখনও দেখে নাই, স্বরূপদাস দেখিতেই লাগিল নিঃশব্দে, নির্নিমেষ নয়নে, নিস্পন্দদেহে, কেবল দেখিতেই লাগিল অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল—এসেছ মা, এই খানেই থাক, পথে ত তোমার কোনও কষ্ট হয় নাই। দরিয়া শুষ্কভাবে বলিলেন, না কোনও কষ্টই হয় নাই, কিন্তু আমি এ বাঁশবনে ত থাকিতে পারিব না, এযে বড় অন্ধকার সূর্য্যদেবকে না দেখিলে আমি মরিয়া যাইব; স্বরূপদাস বলিলেন তা বেশ, কাল তুমি অন্য কুটিরে যাইবে আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি শীত প্রধান দেশের লোক ঠাণ্ডা স্থান আছন্ন করিবে। এই বলিয়া স্বরূপদাস রূপচাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কাল থেকে মাধবীকুঞ্জ খালি করিয়া দিও ইনি সেই খানেই থাকিবেন।" পরে দরিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন তোমার দরিয়া নাম বদলাইতে হইবে মা, তোমাকে বনিতা বলিয়া সবাই ডাকিবে, আর এ পোষাক পরিচ্ছদ ও ছাড়িতে হইবে। দরিয়া জনান্তিকে বলিলেন, "ডুবেছি না ডুবতে আছি দেখি না পাতাল কতদূর।" প্রকাশ্যে বলিলেন যে আজ্ঞা, আপনার অনুমতি অনুসারেই কাজ করিব।

বিধাতার বিধান—দরিয়া আসিয়া স্বরূপদাসের আকড়ায় আত্মগোপন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

কোথায় গেল? এই ভাবনাই সুকুমারের সার হইল, দরিয়ার ফটো পুলিসের মারফত থানায় থানায় চলিয়া গেল। কতলোক কতদিকে ছুটিল কত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যতই দরিয়ার খোঁজ পাওয়া যাইতে লাগিল না ততই সুকুমার অধীর হইয়া পড়িলেন, তাহার ব্যারিষ্টারী বন্ধ হইল, খানা পিনা বন্ধ হইল, যে যাহা বলে তাহার কথা শুনিয়া নিজেই দশ বারবার ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন কিন্তু দরিয়ার কিনারা কিছুই হইল না। ক্রমে সুকুমারের যেন একটু মতিভ্রম হইল। তখন সুকুমারী কলিকাতার বাস তুলিয়া স্বামীপুত্র সহ কাশীতে চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক কাশীছাড়া তাঁহার ত আর পরামর্শ দিবার ও লইবার স্থান নাই। তাহার উপর স্বামীর এই অবস্থা রোজগার পাতি বন্ধ, কলিকাতার ঠাটবাট কি আর বজায় চলে। সুকুমারী কাশীতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বামীজির সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং বলিলেন—হ্যাঁ বাবা আমাকে কি এমনিভাবে সমুদ্রের তটে তটে উত্তপ্ত বালুকাভূমির উপর দিয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে? আর যে ভাল লাগে না, আর যে পারি না, স্বামী থাকিতেও নাই, সংসার থাকিতেও নাই।

স্বামীজি। অমন কথা বলিতে নাই মা। নন্দ বেঁচে থাকুক, তোমার আবার সংসারের ভাবনা। এ একটু কসরৎ করিলেই বা!

সুকু। ক্রমে যে বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছে বাবা। এখন যে ঘরে পাগল বাইরে পাগল, স্বামী পাগল আর যে ছুঁড়িটা পাগল হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে তার বাপই বা মনে করবে কি?

স্বামীজি। তার বাপ কিছু মনে করবে না। সে যে দেশের মানুষ, সে দেশে অন্তর্য্যামী পুরুষের অভাব নাই। উহাদের অনেকে মনে মনে অনেক ঘটনা জানিতে পারে। দরিয়া কোথায় আছে তাহার বাপ সে খবর জানে। ইহা আমি ফাঁকা কথা বলিতেছি না। আফ্রিকায় যে সকল বড় বড় ইংরেজ পরিব্রাজক-রূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন তাহার সকলেই এ তথ্য জানেন সুতরাং সে চিন্তা করিও না, তোমার স্বামীকে আগামী অমাবস্যার নিশীথে আরাম করিয়া দিব। হল ত! আর চিন্তা কিসের।

সুকুমারী। চিন্তা করিয়াই বা লাভ কি, কিন্তু চিন্তা না করিয়া সে অব্যাহতি নাই। হ্যাঁ বাবা এখেলা আর কতদিন চলবে?

স্বামীজি মুচকিয়া হাঁসিলেন এবং নন্দর হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন।

অমাবস্যার নিশীথে—সেবার মঙ্গল বারেই অমাবস্যার নিশি পড়িয়াছিল স্বামীজি সুকুমারকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। হরিশচন্দ্রের ঘাটের কাছে একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরময় গৃহে জন কয়েক নেড়ামাথা দণ্ডধারী পুরুষ বসিয়া কি জপতপ করিতেছিল, কে জানে, কেবল দেখা গেল পরদিন প্রত্যূষে মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী সুকুমার বাড়ি আসিয়া হাজির হইলেন। সুকুমারী স্বামীকে দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিলেন সুকুমার হাসিয়া বলিল, উঠ মা প্রণাম কেন আমায় আসন দাও।

এই মাতৃ সম্বোধন শুনিয়া সুকুমারী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মস্তকের কেশগুচ্ছ গুলি পর্য্যন্ত যেন সোজা হইয়া উঠিল, সুকুমার তাহা দেখিয়া।

আবার হাঁসিয়া বলিলেন, আমার জায়া তুমি, আমার পুত্রের জননী সুতরাং আমারও মাতৃ স্থানীয়া, আমি পুত্ররূপে তোমার স্তনপান করিয়াছি। মা হইবার বাঁকি কি আছে। পুত্রের জন্য তুমি ভাবিয়াছিলে সেই পুত্র হইয়াছে তুমি জায়া ও জননী,—আর রমণী নও, তোমায় মা বলিব নাত কাহাকে বলিব, তোমার মাতৃস্নেহ না থাকিলে আমি কি আবার মানুষ হইতে পারিতাম। এবার মায়ে পোয়ের পালা সুকুমারী জগদ্ধাত্রী হইয়া বস আমি দেখি। তুমিত জগধাত্রী বট, নিজের মুখও আর্শীতে দেখনা, দেখিলে নারীর চোখে নারীর মুখ দেখ। নবজাত আমি—ব্রাহ্মণ আমি—গুরু কৃপায় ধন্য আমি, পুত্রের দৃষ্টিতে তোমায় দেখিতেছি তুমিই আমার জগন্ময়ী মা, আমার শক্তি জননী।

সুকুমারী মাথা হেঁট করিলেন আর তাহার সেই দুই আয়ত নয়নের কোন হইতে দুইটা বড় ফোঁটা টপটপ করিয়া মাটিতে পড়িল। একটা পাঁজর ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ধীরে ধীরে একটি কুশাসন আনিয়া পাড়িয়া দিলেন। সুকুমার বসিলেন। প্রশান্ত প্রদীপ্ত মূর্ত্তি, কষিত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, নাতি স্থূল নাতি দীর্ঘদেহ, ঘনবিন্যস্ত ভ্রূযুগলের নীচে কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটি হইতে যেন ঝলকে ঝলকে হাঁসি উথলিয়া দিয়া দেহ লাবণ্যে যেন আনন্দ বিচ্ছুরণ করিয়া সদানন্দ বিগ্রহের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, এমন সময় নাচিতে নাচিতে নন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল—বাবা এসেছেন বাবা এসেছেন বলিয়া বাপের কোলে যাইয়া বসিল। চাঁদের কোলে চাঁদ ফুটিয়া উঠিল। তখন সুকুমার আবার হাঁসিয়া বলিলেন,—উমে,—সুকুমারী কাছে এসে বস মা। বামে আসিয়া বস জগত সৃষ্টির অপরূপ রূপ পূর্ণতা করুক এই বলিয়া সুকুমার নন্দের চিবুক ধরিয়া আবার বলিলেন হ্যাঁ বাবা

তুমিও বাবা আমিও বাবা। আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার ছেলে। আর আমাদের মা ঐ। দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনী হেলাইয়া সুকুমার সুকুমারীকে দেখাইয়া দিলেন। তখন সুকুমারী চোখ মুছিয়া একখানি লাল বেনারসী সাড়ি পরিয়া জনক বিগ্রহের বাম পার্শ্বে জননীরূপে আসিয়া বসিলেন।

এই সময়ে খট খট করিয়া খড়মের আওয়াজ হইল পাঁচজন সন্ন্যাসী স্বামীজিকে পুরোভাগে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পাঁচজনেই হাত তুলিয়া তারস্বরে মিলিত কণ্ঠে বলিলেন,—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ। জয় অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের সজীব প্রতিমা দেখিলাম। পাষাণময়ী আজ যে প্রাণময়ী হইয়াছে। মা তোমার এই সংসার। এই সংসারের খেলা কর মা, আমরা মা হারা ছেলে তোমায় দেখিয়া মায়ের অনুসন্ধান করি। তারা তুমি নয়নে নিরবস। এমনিই চিত্রে চিত্রিত হইয়া তুমি সজীব সবল থাক আমাদের নয়নের সাধ মিটিয়া যাউক।

এই বলিয়া পাঁচজন সন্ন্যাসী এই যুগল রূপের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সুকুমারী উঠিয়া বলিলেন এ লীলাত হইল এখন নন্দকে ত কিছু খেতে দিতে হবে যাই রন্ধনশালায় যাই।

সুকুমার। নন্দ খাবে আর আমি উপবাসী থাকিব? এই বলিয়া সুকুমার একটু হাসিলেন। সুকুমারিও হাঁসিলেন তখন সুকুমার কম্পিত কণ্ঠে করজোড়ে, বলিলেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মায়া রূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। এবং উদ্দেশ্যে সুকুমারীকে প্রণাম করিলেন। সুকুমারী আবার হাসিয়া চলিয়া গেলেন। হায় রূপ কত খেলাইবেন, যত কাচই কাচঃ—মানুষ তাহা বুঝিবে কি? জীবনের

মহা মরুতে ফল্গুর বুদবুদে যে কত লেখা ফুটিয়া উঠে তাহা কয়জন দেখে কয়জন বোঝে, কয়জন সে বুদবুদের লেখার চারিপার্শ্বে বালুকারাশি অপসারিত করিয়া নিম্নের নিরাবিল, নির্ম্মল, ও শীতল সলিলরাশি তুলিয়া পান করে—স্নান করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবস্থান।

স্বরূপদাস অতি যত্নে অতি আদরে দরিয়াকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার আকড়ায় আহার আচ্ছাদনের অভাব ছিল না, প্রায় নিতাই মহোৎসব লাগিয়াই থাকিত, গান কীর্ত্তনও অনবরত হইত। আর সেই সময়ে মালপুয়া, ক্ষীর, দধি, ফল ইত্যাদির খাওয়া দাওয়া চলিত। অনেকে স্বরূপদাসের এই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অবাক হইতেন, বাবাজীর বিষয় সম্পত্তি নাই, ধনী সজ্জন শিষ্য শাখা নাই, অথচ নিতুই আকড়ায় দীয়তাং ভুজ্যতাং রব শুনিতে পাওয়া যাইত। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটু হাঁসিয়া বলিতেন, "যাঁহার ইঙ্গিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে তাঁহার কৃপায় এই ক্ষুদ্র আকড়াটি চলিবে ইহাতে আর বিস্ময় কি আছে।"

বাবাজীর আকড়া সত্যই একটা গোলকধাঁধা ছিল। উহার ভিতরে কোথায় যে কি অছে কোনখানে কে থাকে, তাহা গ্রামের লোকেই

জানিতে পারিত না। যাহারা আকড়ায় বাস করিত তাহাদের মধ্যেও সকলে সকল খবর রাখিত না। আকড়ার নানা স্থানে নানা দেবঃ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর সেই সকল অসংখ্য দেবমূর্ত্তির নিত্য সেবা ও পূজা হইত। পনর ষোলজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কেহই নিজের দেবতাটি ছাড়া অন্য দেবতার খবরই রাখিতেন না। স্বরূপদাসের আকড়ায় অনাটনের শাসন প্রচলিত ছিল, বাবাজী মাত্রেরই দুইটি কৌপিন দুইটি বহির্ব্বাস ও একখানি কাঁথা অবলম্বন ছিল। কাহারও বা কাঠের কমণ্ডলু কাহারও বা নারিকেল মালার পানপাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৈষ্ণবীদের জন্য পুরা দশহাতি দুইখানি কাপড় আর একখানি তসরের গড়া দেওয়া থাকিত, তাহাদের কাহার ঘরে এক আধটা টুকলীও পাওয়া যাইত। বিছানা পত্র বড় কাহারও ছিল না, বড় জোর একটা মাদুর, একখানা কাঁথা ও একটা বালিশ থাকিত। আহারের সময় কিছু নির্দ্দিষ্ট ছিল না যাহার যখন অভিপ্রায় হইত যে কোনও একটা মন্দির কুটিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেই মাধুকরী পাইত। বিশেষতঃ নিত্যই যখন মহোৎসব ছিল তখন প্রায়ই মালসা ভোগ হইত এবং বাবাজীর পংক্তিতে বসিয়া যাইতে পারিতেন। ইহা ছাড়া বাবাজীর আকড়ায় গাঁজার ধুম খুবই চলিত, যাহারা গান করিত তাহারা গলার আওয়াজে দোহাই দিয়া সকল সময়েই গাঁজা খাইত।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে সাধারণ লোকেদের মধ্যে দুইটা শব্দ প্রচলিত আছে তাহার প্রকৃত অর্থ, আধুনিক মহলে অনেকেই জানেন না, এই দুইটি শব্দ নেড়া ও নেড়ী, প্রকৃত এবং মূল আকার হইতেছে নাড় ও

নাড়ী। বৌদ্ধ সিদ্ধাচারিদিগের সময় নাড় পণ্ডিত নামক একজন সিদ্ধ বৌদ্ধ সহজিয়া প্রচারক আর্বিভূত হন। ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-দের লইয়া একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটা সিদ্ধান্ত সকলেই মানিয়া চলিত। প্রথম ইহারা গ্রামে বা পত্তনে বাস করিত না, বনে বা বাগান বাড়িতেই থাকিত তাই ইহাদিগকে জন সাধারণে বুনো বলিত, দ্বিতীয় ইহারা সঙ্গীতের চর্চা করিত না, সঙ্গীত বিলাসের উপাদান বলিয়া তাহা পরিহার করিত এবং জপই ইহাদের সাধনার প্রধান অবলম্বন ছিল। এক সময়ে এই নাড়া নাড়ীদের বাঙ্গালা দেশে খুবই প্রাধান্য হইয়া ছিল কিন্তু লুই সিদ্ধার আবির্ভাবের পরে ইহাদের প্রাধান্য অনেকটা কমিয়া যায়। লুই সুপণ্ডিত, সুকবি এবং সুগায়ক ছিলেন। তিনি সুন্দর গান রচনা করিয়া তাহাই গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতেন। আমরা যতটুকু প্রমাণ পাইয়াছি তা হইতে আমাদের মনে হয় লুই বাঙ্গালা দেশে সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং মুসলমান আক্রমনের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লুইএর দলেরই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। লুই বজ্রযানী ছিলেন, নাড় পণ্ডিত কতকটা হীনযানী দলভূক্ত ছিলেন তাই উভয় দলের মধ্যে চির বিরোধ ছিল। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রথমে লুইএর দলকে হাত করিয়া, পরে নাড় পণ্ডিতের দলকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লন। তিনি কীর্ত্তনের অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে নাড়া নাড়ীরাও খঞ্জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিলেন, তাই বাঙ্গালার এক প্রবচন প্রচলিত আছে,—যত সব নাড়া বুনে সবাই হল কীর্ত্তুনে—এ প্রবচন পতিত পাবন অবতার নিত্যানন্দের শ্লাঘার সূচক।

স্বরূপদাস, আউলে সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি নাড়াকেও মানিতেন, লুই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মরাজেরও পূজা করিতেন। কেবল রাঢ়ে যে লুইএর পাঁটা বলিদান হইত তাহা করিতেন না। স্বরূপদাস বলিতেন আমি প্রভুর দাস যে কেহ হরিনাম করিবে, তিলক চন্দন করিবে সেই আমার অতিথি হইবে আমি সম্প্রদায়ের বিচার করি না। তথনি বলিব স্বরূপদাস সহজ মতের ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাত্রেই এই সহজমত নানা আকারে প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্য এই সহজ মতকে বৈষ্ণব আবরণে সজ্জিত করিয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার বাহাদুরী। তিনি বাঙ্গলার একটা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বৈষ্ণব আবরণে ঢাকিয়া যান, কেবল ইহাই নহে জগন্নাথ ক্ষেত্রকে বাঙ্গলার বৈষ্ণব দিগের কেন্দ্রক্ষেত্র গড়িয়া দেন পরে রূপ সনাতন বৃন্দাবন আবিষ্কার করিয়া ছিলেন বটে পরন্তু মূল ধরিলে নবদ্বীপ ও পুরীধাম বাঙ্গালার সহজমতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান দুই অঙ্গন। স্বরূপদাস ইহা মানিয়া চলিতেন এবং প্রায়ই হাসিয়া বলিতেন বৃন্দাবন ত বামুন বৈষ্ণবের গড়া উহা নিত্য তীর্থ ক্ষেত্র নহে। আমাদের জুড়াইতে হয়ত নবদ্বীপে যাইব আর পারিত পুরীধামে যাইয়া জগদ্বন্ধু দর্শন করিব।” ইহাই স্বরূপদাসের সার মত।

রূপ। দারোগা মশায় যেন টের পেয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে, কিন্তু তিনি কিছু ভাঙ্গেন না। জিজ্ঞাসা করলেই হাসেন আর থানাও তিন কোষের মাথায় আছে। আমিও বেশী খবর নিতে পারি নাই। নায়েব মশায় সদরে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদেরই লোক নিয়ে গেছে।

স্বরূপ। তাইত। ব্যাপারটা ঘুলিয়ে উঠেছে। অন্য চাল চলিবে না আমি গিয়ে আসনে বসি তুই ওদের ডেকে নিয়ে আয়।

এই বলিয়া স্বরূপদাস ভিতরে গেলেন একখানি ভাল রেশমের নামাবলী বাহির করিয়া গায়ে দিলেন তিলকমাটি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন এবং অপূর্ব্ব বেশে একটি আটচালার মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর যাইয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। ধ্যানী বুদ্ধের আসনের অনুকরণ করিয়াই তিনি বসিলেন রূপচাঁদ সেই অবসরে পাঁচজন বিদেশীকে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। যাঁহার মাথায় জরীর তাজ ছিল তিনি পাঁচটা মোহর সম্মুখে রাখিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন। প্রত্যেকে পাঁচ টাকা করিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। সবাই চ্যাটার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিল কেহই মধ্যের সতরঞ্চ বা জাজিমের উপর যাইয়া বসিল না। রূপচাঁদ অনুরোধ করিলে তাহারা বলিল আমরা বৈষ্ণব অতিথি মহাপুরুষের নিকট আমাদের ধরা আসন গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

স্বরূপদাস যেন কিঞ্চিৎ চমকিত ভাবে নয়ন উন্মীলন করিয়া একটু হাঁসির বিজলী ফুটাইয়া বলিলেন,—"এসেছ বাবা বেশ করেছ, তোমাদের ঘর, তোমাদের বাড়ি, তোমাদের দেবতা, তোমরা ভোগ রাগ দাও, থাক। আমি তাঁহার দ্বারবান মাত্র হুকুমের নফর। আমি প্রসাদ পাই সেবা করি। আমি আর তোমাদের কি আপ্যায়িত করিব। আমার প্রতি যে কৃপা করিলে ইহাতেই আমার জীবন জনম সার্থক হইল।" বাবাজী বলিতে বলিতে গদগদ কণ্ঠ হইলেন, তাঁহার অলক্ষ্যে যেন দুই ফোঁটা চোখের জল তাঁহার ফোলা তাজা মাংশল গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িল। নবাগত-গণ বাবাজীর মুখের কথা শুনিয়া আবার হেঁটমুণ্ডে প্রণাম করিলেন, তখন রূপচাঁদ ইহাদিগকে ইসারা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল এবং আটচালার অপর পার্শ্বের চারিটি কুটির দেখাইয়া বলিল এইখানেই আপনারা থাকিবেন

আপনাদের মালপত্র আনিয়া এই খানেই রাখুন, আমি আপনাদের সেবা করিব। তাজ মাথায় দেওয়া যুবকটি পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিল,—"বেশ বেশ বেশ। তুমি যে সেবা করিবে তার জন্য পারিতোষিক পাইবে আমাদের মালপত্র গরুর গাড়িতে আসিতেছে আসিলেই এইখানে পৌছাইয়া দিও।"

ইহাদের মালপত্র অপর্য্যাপ্ত আসিল, আট দশটা ভাল ভাল ষ্টিলট্র্যাঙ্ক গ্লাডষ্টোন ব্যাগ মোটা মোটা বিছানার গাঁটরী আর সেই সঙ্গে অমনি ভীষণ কৃষ্ণকায় আর চারি পাঁচজন অনুচরও আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন রূপচাঁদকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা পশ্চিমের মানুষ, ডাল রুটি খাই, ঠাকুরকে ময়দা, ঘী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী ভোগ দিয়া তাহাতেই আমরা রুটী ও ব্যঞ্জন তৈয়ার করিয়া খাইব, তোমাদের পাক করা কিছুই খাইব না।" এই কথা শুনিয়া রূপচাঁদের একটু মুখ মলিন হইল। সে যেন একটু শুষ্ক মুখে বলিল—"প্রসাদে আবার জাতি বিচার কি?" অমনি তাহার মুখ থাবড়া দিয়া আর একটি লোক বলিলেন—না, না জাতীর কথা নহে, আমরা যাহা খাই তাহা ত তোমরা খাও না, আর তোমরা যাহা খাও তাহা খাইলে আমাদের পেট ভরে না, তাই বলিতেছিলাম উপাদান ঠাকুরকে অর্পণ করিয়া আমরা তাহা হইতেই কিছু কিছু লইয়া স্ব স্ব খাদ্যসামগ্রী বানাইব। এ পক্ষে কোন নিষেধ আছে কি?

রূপচাঁদ। না তা বড় নিষেধ নাই। তবে সেটা কি ভাল দেখায়? তোমরা মালপুয়া খাও না। ঘীয়ে ভাজা এক একখানা মালপুয়া; তোমরা কয়খানা খাইয়া হজম করিবে? এই সময়ে তাজ ওয়ালা মানুষটি বলিলেন আমার নাম মুকুন্দ সিং। আমি ইহাদের কর্ত্তা, মালপুয়া খাইব না কেন, আমাদের রন্ধন করা সামগ্রী পাছে তোমরা দেবতাকে নিবেদন না কর, তাই

ঐ কথা বলিলাম। তখন রূপচাঁদ হাঁসিয়া গলিয়া যেন ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া গিয়া বলিলেন—তা বেশ বেশ তাই হবে, তোলা উনান আছে তাই আনিয়া দিই। এখানে ত বাজার হাট নেই এই আকড়াতেই আটা, ঘী, ডাল পাওয়া যাইবে তাহাই আপনারা নামমাত্র মূল্য দিয়া লইবেন তখন এক জন বলিল আমাদের রসদ আমরাই লইয়া আসিয়াছি, সে পক্ষে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে।

কথাটা শেষ হইতে না হইতে পুলিশের দারগা যাদবচন্দ্র বাকৃচী তিনটা মুটে সঙ্গে করিয়া ঘী, আটা, ডাল, আলু, তরকারী এবং প্রায় আধমন দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া রূপচাঁদ চমকাইয়া উঠিল। যাদব বাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন পথে আসিবার সময় ইহারা আমাকে এই সকল সরবরাহ করিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন এবং টাকা দিয়া আসিয়াছিলেন। আমার সহিত ইহারা পরিচিত নহেন, তবে জমিদার বাবু নাকি ইহাদের চেনেন। সোজা কথাটা শুনিয়াও রূপচাঁদের মুখখানা যেন কাল হইয়া গেল, সে মনে মনে ভাবিল ভিতরে একটা কিছু আছে। ইহারা কেবল শিকারী বা জমিদার নহে; দেখা যাউক ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

নবাগতদিগের আদরে সে দিন আখড়ায় খুব ধুমধাম করিয়া আরতি হইল, ভোগ হইল, গ্রামের অনেকেই উপযাজক হইয়া আসিয়া প্রসাদও পাইলেন। নবাগতগণ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। সবাই পথশ্রমে ক্লান্ত, শয়ন মাত্রেই সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

রূপচাঁদ তাড়াতাড়ি বাবাজীর কাছে যাইয়া যেন ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বলিল,—বাবাজী যার চিড়িয়া পিঞ্জরে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমার মনে হয় ইহারা সেই চিড়িয়ার খোঁজ করিতে আসিয়াছে, ইহারা কেহই হিন্দুস্থানী

নহে, অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষাটা ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলে, তা ছাড়া দারোগা বাবু আবার এসেছিলেন। তিনি ইহাদের সেবায় নিযুক্ত, খুব আগ্রহ ও খুব ভক্তি। তিনি ত আপনাকে দুই চক্ষের বিষ দেখেন, একটু সাবধান হইয়া চলা ভাল নহে কি?

স্বরূপ। তা বটে রূপো, আমার একটু কেমন কেমন বোধ হচ্ছে! কোথায় ছিলাম রাঢ়ে অজয়ের তীরে, সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম খেতুরে সেখানেও তিষ্ঠুতে পারলাম না। এই বুনো নোনা সোঁদর বনের ধারে ছোট একখানা চাষা গাঁয় এসে আশ্রয় নিয়েছি, তা এখানেও ঐ ছাই পুলিশের উপদ্রব? কি করি? আমার ত মনে হচ্ছে যেদো ব্যাটা আজ আকড়ার চারিদিকেই গোয়েন্দা বসিয়ে রেখেছে, চিড়িয়া ছেড়ে দেওয়াও ত চলে না। দুজন একজন অতিথি নয় যে সাবড়ে দেব, আমারও সঙ্গে শতাধিক বাবাজী আছে। এক একটা বাবাজী অসুর অবতার, কিন্তু নয় দশ জনকে হজম করা কঠিন।

দরিয়া সামান্য একখানি গড়া কাপড় পরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাবাজীর প্রতিষ্ঠিত দেবদর্শন করিয়া বেড়ায়, কীর্ত্তন শুনে, আর নিতান্ত ক্ষুধায় কাতর হইলে, যাহা পায় তাহাই খায়। কোনও সাধ কোনও আকাঙ্ক্ষা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না, কাহাকেও আত্মপরিচয় দেয় না। বাবাজী দরিয়াকে নজরে নজরেই রাখিতেন বলিয়া অন্য কেহ তাহার সহিত মিশিতেও পারে নাই। দরিয়া একটি সেতার পাইয়াছে, সে সেইটি সন্ধ্যার পর নিজে বাজাইত আর গান করিত। শ্রোতৃ থাকি-তেন প্রায়ই বাবাজী, স্বরূপদাসের ভয়ে আর কেহ দরিয়ার কুঞ্জে যাইয়া দরিয়ার গান শুনিতে পাইত না দূর হইতে তাহার তান ও গান শুনিয়া

মুগ্ধ হইত। ক্রমে কানাঘুষা হইতে লাগিল যে এতদিন পরে বাবাজী মনের মত শক্তি পাইয়াছেন, সখি আনিয়াছেন, এবার তিনি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন। কথাটা কাণে কাণে প্রচারিত হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল, গ্রামের লোকেরা বলিতে লাগিল, আহা অপূর্ব্ব সুন্দরী, এমন কেউ দেখে নাই দেখিবেও না। যেমন রূপ তেমনি গুণ, মনোহরসাহী কীর্ত্তন তাহার মত আর কেহই গাহিতে পারে না। মধুকাণের সুরে ও ঢপে সে যেন সিদ্ধ, ইত্যাকার নানারকম গুজব লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইল। কথাটা গিয়া ক্রমে মহলের জমিদার গজেন্দ্র সিংহের শ্রুতি গোচর হইল। গজেন্দ্র সত্যই গজেন্দ্র। একটা বিশাল মেদের পাহাড়, যেন কাল বার্ণিশ করা চামড়ায় ঢাকা—কৌৎসিত্যের আকর, কদর্য্যতার আধার। তা কি বাহিরের রূপে আর কি হৃদয়ের গুণে কোনখানেও তাহার একটু সাদা দাগ ছিল না। এই গজেন্দ্রসিংহ স্বরূপদাসের একজন মনিব ছিলেন, অর্থাৎ স্বরূপদাস ছোট খাট দুই চারিটা কাজ করিয়া গজেন্দ্রের নিকট হইতে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিত। স্বরূপদাসকে গজেন্দ্র ভয় করিতেন এবং সেই ভয়ের কারণ স্বরূপদাসকে পয়সাও যোগাইতেন। স্বরূপদাস কখনও কখনও বাছিয়া গুছিয়া এক আধটা বৈষ্ণবী গজেন্দ্রের কাছে পাঠাইয়া দিত এবং প্রায়ই গজেন্দ্রের নিকট হইতে দুই চারিটি ম্লানমুখী নারী আনিয়া ক্রমে তাহাদিগকে বৈষ্ণবীদলভুক্ত করিত। এই বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর দল দূর দুরান্তর গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আসিত। টাকা পয়সা যাহা উপার্জ্জন করিত সবই বুঝাইয়া স্বরূপদাসকে দিতে হইত। যে দল বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিক টাকা বাবাজীকে দিতে পারিত, সেই দলেরই মান সম্ভ্রম অধিক হইত, ইহাই

হইল স্বরূপদাসের ধনউপার্জ্জনের গুপ্ত ও ব্যক্ত উপায়। এখন তত জোর হয় না, আইন কানুনের কড়াকড়ি বলিয়া সকল কাজই একটু সাবধান হইয়াছে আগে—পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে স্বৈরি কুলমহিলা প্রায়ই বৈষ্ণবীদের গানের মোহে মুগ্ধ হইয়া এই রকমের আকড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইত। কাটোয়া ক্ষেতুর কেঁদুলী, ভাজনঘাটা, বাঘনাপাড়া প্রভৃতি স্থানে এই রকমের অনেক আড্ডা ছিল। এই সকল আকড়া যে কেবল আকড়াই ছিল তাহা নহে Maternity Home এরও কাজ করিত অর্থাৎ অনেক বিধবা যুবতী গর্ভবতী হইলে, এই সকল আকড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইতেন এবং লজ্জা লুকাইতেন। গজেন্দ্রসিংহের অনেক লজ্জা স্বরূপদাস সম্বরণ করিয়া ছিলেন, তাই গজেন্দ্র সিংহের উপর স্বরূপদাসের একটু প্রভাবও ছিল এবং সেই প্রভাবের বলেই স্বরূপদাসের আকড়ায় কখনও অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘটে নাই।

এহেন আড্ডায়—এমন নানা ধর্ম্মের, নানা পাপের আশ্রয়স্থল, আবরণ ক্ষেত্র স্বরূপদাস বাবাজীর আস্তানায় দরিয়া তিন মাস কাটাইল, কিন্তু দরিয়া টলিল না নড়িল না, এক দিনের জন্য একটা সাধ বাসনার কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিল না। সহজিয়াদের মজা এই তাহারা আপনাদের কোন কর্ম্মকে পাপ বলিয়া মানে না, কোনও কুল-কন্যার গর্ভ হইয়াছে গর্ভস্রাব করিতে হইবে আকড়ার বাবাজী ওলটকম্বলের বীজ, দিয়া সে কাজ সাধন করেন, কখনও মনে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাহারা বলেন এসাইত হইবে হইবারই ত কথা, যাহা হইবে তাহাতে আবার মানা কি? নর নারীর অবাধ সম্মিলনে ইহারা দোষ দেখেন না বরং বলেন উহাইত পরকীয়ার মূল নহিলে সে সাধনা হইবে কেমন করিয়া? একে একে সকল তত্ত্ব

দরিয়া জানিতে পারিল সে দেখিল তাহার বাবাজীর মুখনিশ্রিত সহজ মত আর বাঙ্গলায় প্রচলিত সহজ মতের মধ্যে স্বর্গ নরকের পার্থক্য নিত্য বিদ্যমান। প্রেম লইয়া খেলা করিলে তাহার অবনতিতে যে কু-ফল ফলে তাহা বাঙ্গলায় ফলিয়াছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ সেই কদর্য্যতাকে বাহ্যিক বৈষ্ণবী ভক্তির দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, উহার মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। তাই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সাধু ও বাবাজীর দুইটা দল হইয়া গিয়াছে। সাধুর দল নারীর সংস্পর্শ বর্জ্জিত, বাবাজীর দল নেড়া-নেড়ী না হইলে থাকিতেই পারে না। দরিয়া সব বুঝিল সব জানিল ক্রমে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। তাহার গান বন্ধ হইল উল্লাসের যা একটু ভাব ছিল তাহাও যেন শুকাইয়া গেল, দরিয়া উদ্ধারের পথ ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবাগত।

আকড়া গ্রামে একটা নূতন লোক আসিয়াছে। লোকটার মাথায় একটা জরীর তাজ, হিন্দুস্থানের পদ্ধতির মত চুড়িদার পায়জামা পরা, গায়ে জরীর কার্চোপের কাজ করা একটি আচকাণ সোনার গাঁথা বোতাম আছে। লোকটার চোকে মোটা সুর্ম্মা দিয়া দেওয়া, হাতে একখানি রাঙ্গা রেশমের রুমাল আর সঙ্গে চারিজন কৃষ্ণকায় কাফ্রির মতন অতি

বলিষ্ঠ পুরুষ। ইহাদেরও প্রত্যেকেরই পোষাক পরিচ্ছদ পশ্চিমা চংএ। ইহারা গ্রামে আসিয়াই স্বরূপদাস বাবাজীর খোঁজ লইল এবং তাহারই আকড়ায় আশ্রয় লইবার জন্য উপস্থিত হইল। ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই স্বরূপদাস রূপচাঁদকে ডাকিয়া বলিলেন, রূপো এরা কে?

রূপো—বলছে ত হিন্দু কিন্তু রকম সকম দেখে আমার মনে হয় দিল্লীর মুসলমান। শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সময় পথে আমি এমন অনেক মানুষ দেখিয়াছিলাম।

স্বরূপ - চায় কি? আর কেনই বা এসেছে।

রূপ—শুনলাম এরা সুন্দর-বনে শিকার করতে যাবে। সেখানে নাকি কি জমীজেরাৎ কিনেছে, এখানে তিনরাত্রি অবস্থান করে যেতে চায়।

স্বরূপ—তা আসুক না দেউড়ীতেই থাকবে। পূজা কত দেবে?

রূপচাঁদ—ওরা বলে আমরা বৈষ্ণব হিন্দু নিত্য একান্ন টাকা যুগল রূপের ভোগ দিব আর সেই প্রসাদ পাইয়া থাকিব।

স্বরূপ—তা মন্দকি? তিনদিনে শএক দেড়শ টাকা পাওয়া যাবে কতইবা খরচা হবে! থানায় দারগা জানেন? কর্ত্তার নায়েব টের পেয়েছে?

রূপচাঁদ। একেবারেই অতটা ভাব্‌বার প্রয়োজন নেই আর অমন করে পুরাতন কাসন্দিও ঘাঁটায় আবশ্যক ছিল না। কে কোথা থেকে কি শুনতে পাবে, সবইত খড়ের ঘর, বেতের বেড়া তো, আপনি একটু জেগে থাকবেন কুঞ্জে কুঞ্জে বাবাজীদেরও একটু সাবধান করে দিব, কিন্তু রকমটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

স্বরূপ। ছিপ দুইখান যেন ঠিক থাকে। শেষে অভিমন্যুর দশা না ঘটে। নির্গমনের পথটা আগে ঠিক করিয়া রাখ।

এই কথা শুনিয়া রূপচাঁদ ছুটিয়া চলিয়া গেল, সেই দুর্ভেদ্য বাঁশবন ভেদ করিয়া ইচ্ছামতীর একটা বাওড়ে গিয়া দাঁড়াইল, সেখানে অল্প জল এবং ছোট ছোট চড়ার উপর লতাগুল্ম ভরিয়া রহিয়াছে, অন্ধকারে লাঠি ঢক ঢক করিয়া নানাস্থানে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ছিপ দুইটার আওয়াজ পাইলেন না। ষাট বৈটের দু খানা ছিপ, ত্রিশ জন করিয়া মানুষ প্রত্যেক ছিপে বৈঠা বয় আর নক্ষত্রবেগে সে ছিপ চলিয়া যায়, তেমন দু খানা লম্বা ছিপ এই বাওড়ে মশানের উপর লুকান ছিল, কেহ জানিত না কেহ বুঝিত না। পাছে লোকে দেখে বা সন্দেহ করে বলিয়া বাবাজী দুইটা পোষা কুমীর সেইখানে রাখিয়া দিয়া ছিলেন, নিত্য তাহাদের খোরাক যোগাইতেন, কখন কখনও দু' একটা মড়া সেখানে আটকান থাকিত, লোকে ভয়ে ত্রাসে সেখানে যাইত না। এক রূপচাঁদ ছাড়া সে খপর আর কেহ জানিতও না। কিন্তু আজ অন্ধকারে সেই রূপচাঁদ লাঠির ডগায় চির পরিচিত ছিপের আওয়াজ পাইল না। রূপচাঁদ উপরে উঠিল, জলে কর্দ্দমে ও ঘর্ম্মে তাহার দেহ কাঁপিতেছিল, সে কতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া একটু স্ফুট স্বরেই বলিল,—"এ দেখচি বিউতী জাল ফেলেছে। যাই কি পালাই? বাবাজীর রক্ষা নাই, টাকা কড়ি যেখানে যা পোঁতা আছে তা আমি জানি, বাবাজী জানে আর জানে সৈরভী। সৈরভী ত মরে কি জানি কি এক উদ্ভট রোগ হয়ে আছে তার বাকরোধ হয়েছে, সে কোথায় আছে তা আমিই জানি। আমি এখন পালাই, ধর পাকড় খানাতল্লাসী শেষ হইলে তখন চুপি চুপি ফিরে এসে খুঁড়ে খেঁড়ে কিছু লইয়া যাইবার চেষ্টা করিব। আমি যেন বাবাজীর গোলাম, কোন সুখে কোনও মজায় আমি নেই। অথচ আমি

না হলে কোনও কাজ হয় না, কাজ কি আমার বিপদে পা দিয়ে, আমি পালাই।” সহসা সেই বাঁশবন প্রতিধ্বনিত করিয়া অতি গম্ভীর অতি চাপা শব্দে কে যেন বলিল,—পা-লা-ও! সেই শব্দ শুনিয়া রূপচাঁদ মুখ ফিরাইল এবং বলিল,—এ ত অপদেবতার কথা, মানুষের এমন গলা হয় না। অতএব পালাই, কিন্তু এবেশে পালাইলে যে সূর্য্যোদয় হইলেই ধরা পড়িব। তাহার পর কি ভাবিয়া রূপচাঁদ আরও দুই পদ উল্টা দিকে অগ্রসর হইল, সম্মুখেই দেখে একটা বাঁশের উপর একখানা কাপড় শুকাইতেছে। কাপড়খানা দেখিয়াই বলিল, এত সৈরভীর আস্তানা, সৈরভী আছে কি নাই একবার দেখিয়া আসি। বাঁশবনের অপর পার্শ্বে একটী কুটীর তাহার ঝাপ খোলা আছে, কুটীর মধ্যে কেহ নাই কেবল একখানা কাঁথা, দুখানা গড়া কাপড়, তুলসীর মালা লাঠি ও ঝুলী আছে। রূপচাঁদ সেই সকল সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সৌরভী।

সৌরভী গোড়ায় বাল-বিধবা ছিল, এক ঠানদিদির সহিত কেঁদুলীতে পৌষসংক্রান্তির মেলা দেখিতে আসিয়া কি জানি কেমন করিয়া সৌরভী মেলায় রহিয়া গেল, আর তাহার ঠানদিদি সৌরভীকে হারাইয়া হাত মুখ নাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামে ফিরিয়া গেল। বলিয়া রাখি এখনও

এই ভাবে ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ করার নিয়ম বা পদ্ধতি অনেক বাবাজীর আকড়ায় এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, অতি গোপনে এই সকল কাজ হইয়া থাকে, মনে হয় Hypnotism বা সম্মোহন শক্তির প্রয়োগ করিয়া ছেলে মেয়ে ভুলাইয়া লইয়া আসা হয়। রাঢ়ে অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায়; উত্তরে মালদহ ও রাজসাহী জেলায়; পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা, শ্রীহট্ট ও কুমিল্লায় এখনও অতি সংগোপনে বাবাজীর দল নেড়া নেড়ী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সৌরভী ভাল ঘরের মেয়ে ছিল, নবীনা কিশোরী, মেলা দেখিতে আসিয়া এমনি একটা জালে পড়িয়া যায় এবং লজ্জায় আর ঘরে ফিরে নাই। সৌরভীর সহিত স্বরূপদাসের পরিচয় কেঁদুলীতেই হইয়াছিল, তখন স্বরূপকে লোকে তুলসী দাস বলিয়াই জানিত, সৌরভীকে লইয়া কেঁদুলীতে থাকা নিরাপদ নহে; ইহা বুঝিয়া তুলসী দাস কেঁদুলী হইতে একেবারে খেতুরে পলাইয়া যান, সেখানে অনেক দিন ছিলেন, সৌরভীও ছিল, কিন্তু সৌরভী ভিক্ষা করিতে পারিত না, গান করিতে পারিত না বলিয়াই ক্রমে তুলসী দাসের টান কমিয়া যায়; কিন্তু সৌরভী ক্রমে অপরিত্যজ্যা হইয়া উঠিল।

সৌরভী দেখিতে শুনিতে মন্দ ছিল না, একটু আধটু লেখাপড়াও জানিত; ভদ্র ঘরের মেয়ের চাল চলনও, তাহার সব ছিল! "মাগো দুটি ভিক্ষা দাও" বলিয়া সে কখনও কোনও গৃহস্থের বাড়ি দ্বারস্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এজন্য স্বরূপ তাহার উপর মাঝে মাঝে চটিত, উভয়ের মধ্যে একটু আধটু বচসাও হইত, সৌরভী স্বরূপের সকল ইতিহাস জানিত, অনেক গুপ্ত তথ্যও জানিয়াছিল, তাই সৌরভীকে স্বরূপদাস একটু ভয়ও করিতেন, ক্রমে সৌরভীর হাতে স্বরূপ দাসের টাকা কড়ি, গুপ্ত ধন সবই

ন্যস্ত হইল, সেই সৌরভী, যশোর জেলায় আকড়াগ্রামে আসিয়া স্বরূপদাসের নূতন আস্তানার কর্ত্রী হইয়াছিল। স্বরূপদাস এই গ্রামে আসিয়া একটু স্ফুর্ত্তির সহিত, সাহসের সহিত কাজ করিতেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন এ দূর দেশে আমাকে কে চিনিবে, আমার অতীত ইতিহাসই বা কে জানিবে। খেতুর হইতেই স্বরূপদাস এক নূতন ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি চোরাই মালের কারবার করিতেন, যেমন নেড়া-নেড়ী সকল তাঁহার দলে আসিয়া ভিড়িত, তেমনি অনেক চোর ডাকাত, খুনে বদমায়েস, বাবাজী সাজিয়া তাঁহার আস্তানায় কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিত। দারগা যাদব বাবু এ খবর জানিতেন, কিন্তু যাহার পক্ষে জমিদার ও জমিদারের নায়েব, যে অতি বড় চতুর, তাহাকে সহসা গ্রেপ্তার করা কঠিন, তাই কিছু করিতে পারেন নাই।

সৌরভী একটু বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছিল, একটু মেজাজটাও খিটখিটে হইয়াছিল এদিকে স্বরূপদাসের এই নূতন ব্যবসায় ক্রমে ফয়লাও হইয়া উঠিতেছিল। সে এ কাজটায় বড় নারাজ ছিল এবং সর্ব্বদাই স্বরূপদাসকে বলিত এমন কর্ম্ম হজম হইবে না, বাবাজী বৈরাগীর এ কাজ নহে, এ কাজ ছাড়, নহিলে আমি ধরাইয়া দিব। যাদব দারোগা এইটুকু টের পাইয়া সৌরভীর সহিত একটু পরিচয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা স্বরূপদাস বুঝিতে পারেন, আর তাহারই কয়েকদিন পরে সৌরভীর বাকরোধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। স্বরূপদাস তখন সৌরভীকে বাঁশবনের একটা গুপ্ত কুটিরে লইয়া গিয়া রাখেন। সে সমাচারও যাদব দারগা জানিতে পারেন এবং গ্রাম্য একজন নেটিভ ডাক্তারের সাহায্যে সৌরভীকে চাঙ্গা করিয়া রাতারাতী সরাইয়া

ফেলেন, সৌরভীই দারগাকে ছিপের খবর এবং বাঁশবনে গুপ্ত সুড়ঙ্গের খবর দেয়, এ সুড়ঙ্গ স্বরূপদাসের খোঁড়া নহে প্রবাদ এই যে ইহা পুরাকাল হইতেই ছিল এইখানে হরিদাস বাবাজী নামজপে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাই স্বরূপের গুপ্ত ধনাগারে পরিণত হয়।

এইখানে রূপচাঁদের একটু পরিচয় দিব। রূপচাঁদ রাজসাহী জেলার একটা ডাকাতের দলের লঠিয়াল ছিল। তাহার আসল নামটা যে কি ছিল তাহা কেহ জানে না, রূপচাঁদই স্বরূপদাসের চোরাই মালের কারবারের প্রধান কারপরদাজ। প্রয়োজন হইলে দুই একটা ডাকাতিতেও সে হাজির থাকিত। রূপচাঁদ খুব চতুর, সাহসী নীরোগ ও সুস্থকায় পুরুষ। রূপচাঁদ স্বরূপদাসের ভিতরের খবর অনেক জানিত, বেগতিক দেখিয়া এবং যাদব দারগার ফন্দির পরিচয় পূর্ব্ব হইতে একটু জানিয়া ধূর্ত্ত রূপচাঁদ রাতারাতিই পলাইয়া গেল। কারণ রূপচাঁদ জানিত, কিসের জন্য সৌরভীর অসুখ করিয়াছিল, কি জড়ীবুটির সাহায্যে তাহার সন্ন্যাস রোগ ঘটান হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া বা তেমন দুর্গম স্থান হইতে সৌরভী পালাইল; এ সকল খবর রূপচাঁদের জানা ছিল। একরাত্রে নবাগতদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপদাসের আকড়ায় এতগুলা ঘটনা ঘটিয়া গেল, নবাগতগণ কিন্তু ঘুমাইয়াই আছেন। স্বরূপদাস স্বয়ং এ সকল খবর পাইয়া ছিলেন কিনা জানি না। তিনি কিন্তু নিজের আসনেই বসিয়া ছিলেন নড়েনও নাই চড়েনও নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরি সমাপ্তি।

রাত্রি তিনটার সময় যে লোকটা তাজ পরিয়া আসিয়াছিল সে উঠিয়া শৌচাদি শেষ করিয়া একটি ছোট বাঁশী বাহির করিয়া অতি সুন্দর ভাবে ভৈরবীসুর আলাপ করিতে লাগিল, বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই উঠিল, স্ব স্ব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রত্যেকেই এক একটা বাদ্য যন্ত্র বাহির করিয়া সুর বাঁধিয়া বাঁশীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ বেহালা কেহ এসরাজ কেহ সেতার কেহ বা বীণা লইয়া এক অপূর্ব্ব ঐক্যতান বাদনের সৃষ্টি করিল। চতুর্দ্দশীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, জ্যোৎস্না মলিন হইয়া গিয়াছে, একটু যেন গা ঢাকা গা ঢাকা অন্ধকার স্থানে স্থানে জমা হইয়া আছে, স্তব্ধ আকড়া, স্তব্ধ গ্রামপল্লী, দূরে ইচ্ছামতীর কলকল ছলছল শব্দ যেন স্তব্ধ; এই স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া অপূর্ব্ব সুর লহরী গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিল, সমগ্র গ্রাম যেন সেই শব্দে সেই সুরে গুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সহসা বাঁশবনের দিকে বিহঙ্গ কলরব হইল বুঝি বা তাহারাও এ সুর শুনিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে পারিল না। একে একে অনেকগুলি বাবাজী সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া সেই খানে আসিল সবাই চুপ করিয়া বসিয়া যন্ত্র সঙ্গীতের আলাপ শুনিতে লাগিল, তাহার যেন কি এক মোহিনী শক্তি আছে, যত সুর চড়িতে লাগিল; যত আলাপের মাধুরী ফুটিতে লাগিল ততই যে যেখানে আছে নেড়া নেড়ীর দল সবাই আসিয়া সেইখানে জমায়েৎ হইল।

এ কি এ! এ যে চেনা বংশীধ্বনী, এতদিন পরে ঠাকুর কি তোমায় কৃপা হইল? আমি অবোধ নারী আমি কি বুঝি ঠাকুর! তুমি না রাখিলে আমায় কে রাখিবে। এই বলিয়া দরিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, উদ্দেশ্যে ভগবানকে বার বার নমস্কার করিল, শেষে নিজের কুটির ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোথাও কেহ নাই মনুষ্য-শূন্য স্থান কেবল বংশীধ্বনি শুনা যাইতেছে, আর গা ঢাকা কাক জ্যোৎস্না ফুটিয়া আছে। পা পা করিয়া দরিয়া অগ্রসর হইলেন, আর কাণ পাতিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। হাজার হউক নারী সুগায়িকা, দরিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, আগাইয়া আসিতে আসিতে সেও গান ধরিল—

আঁখি লাগি রহেও বনয়ারী।

(সখী) দুলালী গেও ঘর ছোড়ী॥

গানের তান পরদায় পরদায় উঠিতে লাগিল, পঞ্চমে বাঁধা বাঁশীর সুরকে যেন চাপিয়া নারীকণ্ঠের বংশীধ্বনী প্রভাত গগণকে শব্দময় করিয়া তুলিল। ক্রমে সে গান নিকটে আসিতে লাগিল, ক্রমে বাণীশুদ্ধ বুঝা যাইতে লাগিল। যিনি বাঁশী বাজাইতেছিলেন তিনি মুখের বাঁশী মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন, অই আই হ্যায় তুম সব বাজাও। ক্রমে সেই গানের শব্দ সেই অঙ্গনের সম্মুখে আসিয়া ফুটিয়া উঠিল। তান মান লয় শুদ্ধ গান যেন ঝলকে ঝলকে মাধুরী ছড়াইতে লাগিল। নবাগত মাথার তাজ ফেলিয়া দিয়া, আচকানের গলার দুইটি বোতাম খুলিয়া দিয়া, শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া দরিয়ার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, আও পিয়ারী, ইহাঁ পাধারো। দরিয়া কিন্তু কোনও উত্তর করিলেন না, শব্দময়ী দরিয়া উদাস ভৈরবী তানে প্রাণ ঢালিয়া গান করিতে লাগিলেন, আঁখি লাগী

রহে ও বনয়ারী। সেই গানের পূর্ব্বে রোদন এবং আশার উল্লাস জড়িত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সবাই ঐক্যতানবাদন বন্ধ করিল, নীরবে বিস্ময় বিস্ফরিত নেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া সেই গানই শুনিতে লাগিল। এমন সময় ভুতের মত নিঃশব্দে আরও জনকয়েক লোক আসিয়া সেই মণ্ডলীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, সবাই গান শুনিতেছে। এতটা নিস্তব্ধতা ক্রমে যেন দরিয়ার হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করিল এবং ভয় চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া, কে গুরুজী,—এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা চারিপার্শ্বে বেষ্টন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল, আমারও কাজ শেষ হয়েছে ঠাকুর। আমি সব পাইয়াছি কেবল দুই জনকে পাইলাম না, প্রথম রূপো ডাকাত বা রূপচাঁদ, দ্বিতীয় খোদ স্বরূপ-দাস, সে যে কোথায় গেল, কেমন করিয়া গেল, তাহার ত কোনও হদিশ করিতে পারিতেছি না, অনেক মাল পাইয়াছি, অনেক ডাকাতীর কিনারাও হইবে, এখন অনুমতি করুন এই কয়জনকে ধরিয়া লইয়া যাই। আর আপনি দুই দিন আগড়ায় বিশ্রাম করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করুন।

সেই নবাগত পুরুষ আবার তাজ মাথায় দিয়া বলিলেন, বহুত আচ্ছা। বেশ করেছ, আমার ও সকলের কোন প্রয়োজনও নাই, আমি দরিয়াকে পাইয়াছি তাহাকে লইয়া আহারাদির পরে বেলা দশটার পর নৌকায় করিয়া বনগ্রাম ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইব। এই সময়ের মধ্যে তোমার যাহা কিছু করণীয় আছে তাহা শেষ করিয়া লও।

যাদব দারোগা বলিল, যে আজ্ঞা তাহাই হইবে। আমি আপনার দাসানুদাস, আপনি না আসিলে আমি কোনও কিনারাই করিতে পারিতাম

না। সৌরভীকে বাঁচাইতে পারিতাম না, এ গোলক ধাঁধা আকড়ার মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা জানিতেও পারিতাম না। আপনাকে কি বলিব আমিত বুঝিয়া পাই না।

নবাগত। ভগবানকে খুঁজিয়া পেলে না ?

দারোগা। সে ত দরিয়াকে আনিয়াই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা সৌরভীত বলিতে পারিল না। তাহার জন্য ভাবিও না। জমিদার গজেন্দ্র সিং সকালে বেলায় আসিবেন, তিনি আসিলেই, আইনের সকল কাজ হইবে, এ দিকে আকড়ার সুড়ঙ্গ পথ ও মাটির নিচের ঘরগুলির তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।

নবাগত। আমি ভগবানকে চিনি, স্বরূপদাসকেও জানি। এই শ্রেণীর লোকেই বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মটাকে—সহজমতকে অতি জঘন্য ও হেয় করিয়া দিয়াছে। ভাল লোক যে নাই এমন কথা বলি না, কিন্তু তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবেই আছেন। কোনও আকড়া বা মন্দিরের আশ্রয়ে থাকেন না। স্বরূপদাসের শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় অধিক। আমি দরিয়াকে সদা সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতাম, আমার লোক কলিকাতার বাসায় ছিল। তাই যেদিন দরিয়াকে লইয়া ভগবানদাস পলাইয়া আসে আমি সেই দিনই খবর পাই। ভগবান একটু Hypnotism জানে। তা যাই হউক বাবা এক ঢীলে দুই পাখী মরিল তোমার এলাকাও পবিত্র হইল, আর জমিদার গজেন্দ্র সিং নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনিও যে লোক ভাল তা নয়। তবে তিনি কেবল লম্পট। যাউক সে কথা আমার হারানিধি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি, আমার কন্যা আমার কাছেই আসিয়াছে। আমি ইহাদিগকেই লইয়া সোজা এলাহাবাদই যাইব।

এই সময় দরিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিল এবং গুরুজীর দিকে তাকাইতে লাগিল, যে কয়টি লোক বসিয়াছিল তাহাদের সকলকেই লক্ষ্য করিতে লাগিল। একজনকে দেখিয়া অনেকক্ষণ তাকাইয়া বলিল, তুমিই না হোসেনখাঁ। সে লোক মুচকি হাসি হাসিয়া, অমল-ধবল একজোড়া দন্তপাতি বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, উহুঁ কলিকাতায় ছিলাম হোসেন খাঁ এখন আমি হনুমানদাস, পরে কি হইব কে জানে। এই কথা শুনিয়া দরিয়া মাথা হেট করিল। কতক্ষণ ভাবিয়া বলিল, উহু তুমি হোসেনখাঁও নও, তুমি হনুমানদাসও নও তুমি যে কে তা হাবসী জানে—বলনা জানে না ?

হনুমানদাস। চুপ পাগলী! অত কথা কয় না। শিষ্য আমরা হুকুমের নফর। গুরু যখন যাহা আদেশ করেন তখন তাহাই করি। আমাদের কি নাম ধাম পরিচয় আছে।

দরিয়া আর কোনও কথা বলিল না। ক্ষণেক পরে গান ধরিল—

আমার মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে ঘুরে বেড়াই আসে পাশে
বনদেবীর বনলতা আমার জগত জীবন আছে কোথা
পেয়ে বুঝি কসনে কথা
তাই তোদের কুসুম হাসে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

প্রভাত হইল, বিহঙ্গ কলরবে সেই ক্ষুদ্র গ্রাম মুখর হইয়া উঠিল। আকড়ায় কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে শুনিয়া গ্রামস্থ অনেকেই ছুটিয়া আসিল। গ্রাম্য লোক সব হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় সেই ক্ষুদ্র জনতা ভেদ করিয়া এক মুসলমান ফকির—কৈ কাহু মগণ, ন্যায় ও হাশী মে মগণ। এই বলিতে বলিতে সেই ক্ষুদ্র জনতা ভেদ করিয়া আকড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। গুরুজী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া আনিলেন। ফকির চারিদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—"বেটি মেরী।" দরিয়া পার্শ্বের ঘরেই ছিল, আওয়াজ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেনুমী পিতাকে চিনিতে পারিয়া একেবারে তাহার ক্রোড়ে যাইয়া বসিলেন। সেনুমী গুরুজীর দিকে তাকাইয়া বলিল, বড় কাঁচা নোয়া মেয়ে আমার। ইহার দ্বারায় তোমার কাজ হইবে কি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া দরিয়ার দিকে তাকাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, কেমন মা চল আমরা দেশে যাই। আমরা সবাই পরামর্শ করিয়া তোমার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম। ঐ হোসেনখাঁ বা হনুমানদাস না থাকিলে তোমার খবর সত্ত্ব সত্ত্ব পাইতাম না, এবং এত শীঘ্র তোমার উদ্ধার হইত না। উনি খবর দিয়া তোমাদের পিছু ধরিয়াছিলেন, এবং এই আকড়া গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া দারোগাবাবুর সহিত পরিচিত হইয়া তোমার উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

উহাকে চিনিয়াছ ত ? যাহার স্বামী বেদখল করিতে চাহিয়াছিলে উনি তাঁহারই ভ্রাতা।

নবাগত। কাঁচা লোহা থেকেই ইস্পাত তৈয়ারী হয়। কেবল পোড় সহাইতে হয়। খাঁটি বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানীর দ্বারা যে কাজ হইবে না আমি সেই কাজের জন্য দরিয়াকে বাছিয়া রাখিয়াছি। দরিয়া স্বয়ং যাইতে চায় যাইতে পারে।

দরিয়া। এসেছি যখন যাব কেন ? তারপর আমিও ত শিষ্যা উনি হুকুমের নফর হইতে পারেন, হনুমানদাস হোসেনখাঁ প্রভৃতি সাজিতে পারেন আর আমি প্রতিদানে কিছুই পারিব না। আমার যেন মনে হয় গান আমি করি না আর কে করে। ভাব আমি দিই না আর কে দেয়। আমার ভিতর দিয়া আর একজন কাজ করিতেছে, কাজেই বলিতে হয় আমার ত কোনও স্বাধীনতা নাই। আমায় যাহা করাইবেন আমি তাহাই করিব।

সেনুগী। সাবাস বেটী। মানুষের রক্ত তোমার দেহে আছে। তুমি যে উত্তর করিয়াছ তাহাতে আমি সুখী হইয়াছি। আমরা সব এক শিকলে বাঁধা, এক কাজের কাজি। তোমার গুরু আমি, অঘোরী বাবা, স্বামীজী, আমরা সবাই এক কারিগরের অধীনে নানা রকম গড়ন গড়িতেছি ক্রমে সব জানিতে পারিবে।

এমন সময় একটা পাল্‌কির বেহারার শব্দ হইল, কে যেন আসিতেছে বুঝা গেল, গ্রামস্থ লোক সরিয়া দাঁড়াইল বাবু গজেন্দ্র সিং জমিদার অতিকষ্টে তাঁহার স্থূল মসীময় দেহ, পালকী হইতে বাহির করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাদববাবু হাজিরই ছিলেন তিনি সিংহ প্রবরের হাত ধরিয়া

সেই মণ্ডলীর সম্মুখে আসিলেন। গজেন্দ্র সিং কোনও রকমে মাথা নোয়াইয়া হাত দুইটি তুলিয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, আমি মহাপাপী, আমার দিন শেষ হইয়াছে। ঐ হনুমানদাস না থাকিলে এ যাত্রা এ দেহ বিফলই যাইত, আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি আদেশ করুন আর কি করিতে হইবে।

গুরুজী (নবাগত)। সত্যের পথে থাকিয়া তুমি দারোগাবাবুর সাহায্য কর তাহা হইলেই আমাদের কাজ করা হইবে।

গজেন্দ্র। একটা সত্য কথা বলিব। আমি স্বার্থের তাড়নায়ও একাজ করিয়াছি। ইদানীং স্বরূপদাস আমার উপর একটু অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। কেবল ভয় দেখাইয়া আমার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আনিত এবং চোরাই মাল রাখিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিত, মানভয়ে আমি কোনও কথা স্পষ্ট বলিতে পারিতাম না, বাজে ওজর করিয়া তাহার কথা কাটাইয়া দিতাম, আমি লম্পট ছিলাম বটে, কিন্তু চোর ডাকাত নহি ভদ্র ঘরের ছেলে। এই হনুমানদাস বাবাজী আমার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন এবং উহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া আমি এক ঢীলে দুই পাখী মারিয়াছি। স্বরূপদাসের উচ্ছেদসাধন করিয়াছি, আমার সুনাম সুযশও বজায় রাখিয়াছি কিন্তু আর ভাল লাগে না। এ ছলনা আর ভাল লাগে না। কাল রাত্রি থেকে আমার প্রাণ উদাস হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারীর কাজ ছেলেদের বুঝাইয়া দিয়াছি এইবার অনুমতি করেন ত আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাই।

গুরুজী। একেবারেই শ্রীবৃন্দাবন যেয়ে উঠতে পারবে না। এখানকার কাজ শেষ করিয়া নবদ্বীপে যাইয়া থাকিও। তাহারপর যখন দিন হইবে

তখন বৃন্দাবন আমিই লইয়া যাইব। আপাততঃ দারোগাবাবুর সাহায্য কর স্বরূপদাসকে খুঁজিয়া বাহির কর।

এমন সময় সেইখানে সৌরভী আসিয়া দাঁড়াইল এবং করযোড়ে বলিল, পতিতপাবন অবতার আমার প্রতি তোমার কেমন কৃপা হইবে? আমি কে ছিলাম তা ত তুমি জান, কি হইয়াছে তাহাও দেখিতেছ। স্বরূপ-দাসকে তোমরা আর পাইবে না সে মরিয়াছে। ইছামতীর তটে বাঁশ বনে তাহার মৃত দেহ পড়িয়া আছে। এই ভোর রাত্রে পালাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছি, সেখানে সাপও মরিয়া আছে আর এই মানুষ সাপটারও দেহ পড়িয়া আছে। এখন আমাকে মরিতে বলেন কি? আর বেঁচে লাভ কি? এতদিনই বা বেঁচে করিলাম কি?

গুরুজী। মরণের অধিকার মানুষের নাই। যখন যাহার ডাক হইবে তখন সে যাইবে। তুমি মরিতে পাইবে না, এই মামলা শেষ হইলে যাদবধাবুই তোমাকে প্রয়াগে পাঠাইয়া দিবেন। আমি সেইখানেই তোমাকে রাখিব। তুমি ত মরিয়াছিলে। হনুমানদাস ডাক্তারবাবুই ত বাঁচাইয়া-ছেন। এখন তোমার দেহ তাঁহাদের অধিকারে। তাঁহারা উভয়েই আমার দাস, আমি যাহা বলিব তাঁহারা তোমাকে তাহাই করিতে বলিবেন অতএব ক্ষোভ দুঃখ অনুতাপের প্রয়োজন নাই যাহা বলি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দাও।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর গুরুজীর যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। তিনি দারোগা বাবুকে বলিলেন, একটা কাজ করিও, যে সকল প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহ এখানে আছে একটি ইটের ঘর করিয়া তাহাদের রক্ষা করিও এবং তাহাদের সেবা ও ভোগ রাগাদির জন্য গজেন্দ্র সিংহের সহিত

পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিও। এত বড় আকড়াটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিও না। গুরুজী এই কথা বলিয়া উঠিলেন এবং কক্ষান্তরে যাইয়া তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া আসিলেন। তখন সকলে মিলিয়া সামান্য কিছু আহারাদি সমাপন করিয়া চারি পাঁচখানা নৌকায় যাইয়া উঠিলেন, দরিয়া গুরু ও জনক সহ তাহার বন্ধনভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই ব্যাপারে দরিয়া প্রথম পোড় খাইল। এক পোড়েই সে অনেকটা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে এখন আর কথায় কথায় মানুষের দিকে তাকায় না নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার স্পর্দ্ধা করে না, এখন সে বিপদে পড়িলেই মধুসূদন স্মরণ করে। সকল শক্তি সকল বলের আধার ভগবানের শরণাগত হয়। মানুষ যে কত দুর্ব্বল তাহা সে একটু বুঝিতে পারিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাম।

সুকুমার কাশীতে আসিয়া কেবল পুনরভিষিক্ত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দণ্ড গ্রহণও করিয়াছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ছেলেটাকে যে আদর্শে গড়ে তোলা হচ্ছে আমি যদি সেই আদর্শের মত কতকটা না

হতে পারি, ছেলে হবে কেন? তোতা পাখীর মত কেবল সংস্কৃতই শিখবে স্বভাব দোরস্ত হবে না, আমি যখন ব্যারিষ্টারী করি কলিকাতায় থাকি তখন কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল, আর আমার এক কথায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের পোষাক পরিচ্ছদও দেখিয়া সেও কোট পেণ্টুলেন ধরিয়াছিল। বাপ যাহা করিবে প্রায় ছেলেই তাহা করিয়া থাকে, বিশেষতঃ বাপ যদি ইংরেজি হিসাবে উচ্চ শিক্ষিত পদস্থ এবং উপার্জ্জনশীল হন তাহ'লে ত কথাই নেই, ছেলে বাপের নকল নবীশ হইবেই। স্বামীজী বলেছেন ছেলেটাকে খাঁটি বামুন করে গড়বেন কাজেই এই বেলা আমাকেও খাঁটি বামুন হতে হচ্ছে। অন্ততঃ বাহ্যিক আচারে ব্যবহারে ত হইতেই হইবে। এই যুক্তি বাবা প্রদর্শন করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহা বাহিরের কথা, সুকুমারের প্রাণের ভিতর একটা ওলট পালট হইয়াছিল। গুরুর কৃপায় তাহার বুদ্ধি স্থির হইল বটে সঙ্গে সঙ্গে মনের শান্তির আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হইল। সে সুকুমারীকে বলিল, যাহা আছে, যাহা উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে মাসে তিন শত টাকার উপর আয় হইবে, নন্দকে লেখাপড়া শিখাইবার পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত। যত দিন ভিক্ষা করিতে না শিখি—না পারি, তত দিন তোমার আমার উদরান্নের জন্য মাসে মাসে দশ পনের টাকা আমরা আয় করিব।

সুকুমারী বলিলেন,—টাকার ভাবনা আজ পর্য্যন্ত ত ভাবিতে হয় নাই, কাল খাইব এ চিন্তা ত কখনও মনে জাগে নাই, সুতরাং তোমার অত হিসাবের কথা আমি বুঝি না। যখন ভগবানের নামে দেহ উৎসর্গ করিয়াছি তখন ভাত কাপড়ের ভাবনা কেন?

নন্দকুমার শাস্ত্রীর কাছে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতেছে, স্বামীজি

তাহাকে প্রত্যহই পুরাণ হইতে এক একটা গল্প পড়িয়া শুনান, এবং সে গল্পের উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। নন্দ তেজস্বী বালক তাহার অভাব বোধও নাই, সখ বিলাসও এখনও সে বোঝে নাই। সন্ন্যাসী বালকের সহিত সে শৈশব হইতেই ধূলা খেলা করিয়াছে। সাত আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রায় নগ্নাবস্থায় কাটাইয়াছে। এখন এক-খানা কোমরে কাপড় পাইয়াছে তাহাতেই সে খুসী, মেধাবী বালক বিদ্যায় অনুরাগ খুবই আছে তাই সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে একটু ইংরেজিও শিখিতেছে। স্বামীজি বলেন ইহা কাল প্রভাব। সমাজে রাজার জাতীয় প্রভাব পূর্ণভাবে বিস্তীর্ণ, সে প্রভাব এড়ায় কাহার সাধ্য, গগন, পবন, গৃহ, ঘর বাহির সর্ব্বত্রই সে প্রভাব বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, নন্দ ত ভারত ছাড়া নহে তাই তাহাকেও ইংরেজি শিখিতে হইতেছে।

নন্দর এখনও ব্রাহ্মণ্য স্পর্দ্ধা ফুটে নাই, সে সরল উদার হাস্যমুখ বালক সে কেবল শুনিয়া রাখিয়াছে যে কাশীতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই, কাহারও বাড়িতে খাইতে নাই, মায়ের কাছে বসিয়াই সে আহারাদি করে, মা কাছে না বসিলে তাহার আহার হয়ই না। ইহা ব্রহ্মণ্য বিশিষ্টতা নহে, পুত্রজীবনের মাধুরী মাত্র।

সুকুমারী, পুত্রময় জীবিত হইয়া আছেন। নন্দ ছাড়া আর তাঁহার কোনও চিন্তা নাই, তাহারই খাওয়া পরা লইয়া তিনি দিবাভাগ অতি-বাহন করেন, ক্ষীর সর নবনীত তৈয়ার করিয়া রাখেন, ছেলে আসিয়া খায়, তিনি তাহাই দেখিয়া কৃতার্থ হন। আহার সম্বন্ধে ছেলেও মায়ের কথা অবিচারিত চিত্তে পালন করিয়া থাকে তাই সে নীরোগ নির্ম্মলকান্ত এবং কাশীবাসীর নয়নাভিরাম হইয়া উঠিয়াছে। সুবর্ণবলয় কুন্তল শোভী

মুণ্ডিত মস্তক নগ্নপদ গৈরিকধারী স্ফুট গৌর বর্ণ নন্দ মহারাজকে কাশীর পণ্ডিত সজ্জন মাত্রেই চিনিতেন, সকলই আদর করিয়া নন্দ মহারাজ বলিয়া ডাকিত এবং কাশীবাসী অনেক ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে কাঁধে করিয়া নাচিত খেলা করিত। নন্দ খেলায় বাবু ছিল, কিন্তু কিজানি কেন কখনও কাহার নিকট কিছু ফরমাইস করে নাই।

সুকুমার গৈরিক ধারণের পর হইতে উদয়াস্ত প্রায় জপই করিতেন। প্রথম রাত্রে সন্ধ্যা আহ্নিকের পর ছেলেকে লইয়া কখনও কখনও ইংরেজি ভাষার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ শান্তি, তৃপ্তি ও তুষ্টিতে এই ব্রাহ্মণ পরিবারের, ব্রাহ্মণ দম্পতীর দিন কাটিতে লাগিল মাঝে মাঝে স্বামীজি আসিয়া, শাস্ত্র কথা বলিতেন বুঝাইতেন ইহারা উভয়ে বসিয়া তাহা শুনিত এবং নিশ্চিন্তে দিন কাটাইত। সুকুমার প্রায় বলিতেন বাকী কয়টা দিন যদি এমনই কাটে ত ভাগ্য মানিব। আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভাল লাগে না, কেমন যেন একটু অরুচি, জীবনের সুখ বিলাসেও অরুচি হইয়াছে। পক্ষান্তরে সুকুমারী ক্রমে ক্রমে পাষাণ প্রতিমা হইয়া উঠিলেন। তাহার মুখে হাসি নাই, অথচ বিষাদের ছায়াও কেহ লক্ষ করিতে পারিত না, প্রসন্ন বদনে, নিশ্চয়ই প্রসন্ন মনে সুকুমারী দিন যাপন করিতে ছিলেন। তখন কাশী উৎসবময়ী পুরী ছিল সকল পল্লীতেই নিত্য গান কথকতা হইত, সুকুমারী কখনও কখনও শুনিতে যাইতেন আর বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন, পঞ্চক্রোশী কাশী প্রদক্ষিণ দণ্ডী ভোজন, কুমারী সেবা ইত্যাদি ব্রত নিয়ম সুকুমারীর লাগিয়াই ছিল। এসব কার্য্যে সুকুমার বাধা ত দিতেনই না অনেক ক্ষেত্রে পত্নীর অনুসরণ করিতেন এবং যথাবিধি ব্রত কার্য্য সুসম্পন্ন করাইতেন। এই সময় সুকুমার দরিয়ার নামটি পর্য্যন্ত

উচ্চারণ করেন নাই, সুকুমারীও ভয়ে ভয়ে কিছু বলে নাই। দরিয়া কোথায় কেমন আছে একদিনের জন্য এ জিজ্ঞাসা সুকুমারের মুখ হইতে বাহির হয় নাই। হায় দরিয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রিবেণী সঙ্গমে।

মাঘ মাস, প্রয়াগে কুম্ভমেলার বড় ধুম, এবার দ্বাদশ বার্ষিকী পূর্ণ কুম্ভ। ভারত বর্ষের প্রায় সকল স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ফকীর আসিয়া জমিয়াছে। বড় বড় আকড়ার বাবাজী সম্রাটের ঐশ্বর্য্যকে যেন তুচ্ছ করিয়া হাতি ঘোড়া লোকজন আসা সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিশাল সঙ্গমের ও ঝুশীর চড়ায় লক্ষ লক্ষ নর নারী আসিয়া বাস করিতেছে। একদিকে কল্প বাসের জন্য সারিগাঁথা অসংখ্য ঝোপড়া তাহাতে অন্যান্য নরনারী সংযম করিয়া কল্পবাস করিতেছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের সামন্ত রাজগণের বড় বড় তাম্বু ও সামিয়ানা পড়িয়াছে নিত্য সদাব্রত চলিতেছে, দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে সেদিকটা সর্ব্বদা যেন মুখর হইয়া আছে। এক এক সময়ে এমন অবস্থা ঘটিতেছে যে কাঙ্গাল ফকির অপেক্ষা দাতার সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিতেছে দান গ্রহন করিবার লোকই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। একদিকে অতুল ঐশর্য্যের বিকাশ অন্য দিকে তেমনি অগাধ দারিদ্র ও সন্ন্যাসের বিস্তার, ইহার মধ্যে আবার

কোটিশ্বর গোস্বামী বা আকড়াধারী বাবাজী সকল ঐশর্য্য পরিহার করিয়া নগ্ন বালুকা বিস্তারের উপর শুইয়া আছেন, অথচ তাঁহার আড্ডায় তাঁহার আসনে প্রত্যহ সহস্র সহস্র মুদ্রাদান হইতেছে। বস্ত্র দান অন্ন দান নিত্য চলিতেছে, আর তিনি আর কাহারও সদাব্রতে এক টুকরা রুটী চাহিয়া খাইয়া দিন যাপন করিতেছেন। অর্থের প্রতি এমন অবহেলা আর কোথাও পাওয়া যায় না। মেলা ত বটেই, তখন বাজার হাটও বসিয়াছে কেনা বেচাও চলিতেছে আর পাদ্রীদের বক্তৃতা, আর্য্য সমাজীর বক্তৃতা, সে সব খেলাও আছে। সন্ন্যাসীই কত রকম নাগা, ফকির, ন্যাড়া, ঊর্দ্ধবাহু, অধোমুখ, সার শয্যাশায়ী, কেহ বা বিষধর সর্প সজ্জায় সজ্জিত এমন নানা রকমের অপূর্ব্ব ভেকের সাধু সন্ন্যাসী ফকির অবধূত অসংখ্য। ঠিক এইভাবের মেলা, এই রকমের মেলা, পৃথিবীর আর কোনও দেশেত হয় না, হরিদ্বার ছাড়া এত বড় কুম্ভমেলা আর কোথাও হয় না। ইহা ভারতবর্ষের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের মহা সম্মিলন। পূর্ব্বে যখন হিন্দু স্বাধীন ছিল বা মুসলমানের আমলে অর্দ্ধস্বাধীন রাষ্ট্রপতি ছিল তখন সকল স্বাধীন নরপতি এবং রাষ্ট্রপতি হয় স্বয়ং নয়ত প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থিত হইয়া সাধু সন্ন্যাসী সম্মিলনের মতামত সংগ্রহ করিয়া লইতেন এবং সেই মতামত অনুসারে বৎসরের পর বৎসর ভারতবর্ষের নানা হিন্দু সম্প্রদায় শাসিত ও পরিচালিত হইত। এখনও যে সেটা না হয় তাহা নহে তবে যেন একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে হয় অথবা ইংরাজি শিক্ষিত সমাজ ইহার খবর রাখেন না বলিয়াই প্রকৃত কথা এখন বাহির হয় না। যাহা পূর্ব্বেও মুখে মুখে ছিল তাহা এখনও মুখে মুখে আছে। ইহাই বোধ হয় সাধু সজ্জন সমাজের অভিপ্রেত।

অমাবস্যা স্নানের আর দুই দিন বাকি, অসম্ভব জনতা চারি দিকে হইয়াছে, গবরমেণ্ট এই জনতা সামলাইবার পক্ষে যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সংগমের কাছে চড়ার উপর মেলাটা একটু অধিক। খুব বড় চড়া পড়িয়াছে অনেকটা হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিতে হয় তাই এখানে অনেক দোকান পাটও বসিয়াছে। একটা তাঁবুর পার্শ্বে কতকটা খালি জমীর উপর বেশ একটু জনতা হইয়াছে। অনেকগুলি নরনারী কাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কি শুনিতেছে। শুন, শুন, এই কোটীকণ্ঠের গুঞ্জন ঝঙ্কারকে শুষ্ক করিয়া কাহার কণ্ঠস্বর উর্দ্ধে উঠিতেছে, গলার আওয়াজটা যেন একটু চেনা, যে শুনিতেছে সেই বলিতেছে, আহা কি মিঠিয়া আওয়াজ, গানের কি কর্ত্তব্য এমন ত শুনি নাই। একটু কাণ পাতিয়া শুন দেবী কি গান গাহিতেছে গানের একটি কলিই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

কামনা ছোড়ও নেহী হাম নাথ কেয়া করে

গানের সুর পরদায় পরদায় উঠিয়াছে, ইহার কি গলা কাটে না এত চড়া উচু আওয়াজ কি মানুষের হয়?

সহসা এক দিব্যকান্ত সুগৌর বর্ণ দণ্ডী—ভৈরবী সমেত দণ্ডী—গাঁটছড়া বাঁধা ভৈরবীর হাত ধরিয়া যেন অনায়াসে সেই লোক সংঘকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, জনতার অনেকে এই ঠেলা ঠেলীতে একটু রুষ্ট হইল বটে কিন্তু ঠেলায় বেশ অনুভব করিয়া বুঝিল লোকটা অপূর্ব্ব বলশালী পুরুষ ইহার সহিত ঠেলা ঠেলী করা চলিবে না তাই সে দুর্ভেদ্য জনতাও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এই নরনারীকে প্রবেশ করিবার পথ দিল। নরও যেমন সুন্দর নারীও তেমনী অপূর্ব্ব সুন্দরী ভুবন মোহিনী, আর

সেই যুগল রূপের তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের উপর গৈরিক বসনের আভা পড়িয়াছে, সে এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। পুরুষের হাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু নারী আনতমুখ তাঁহার হাতে একটি ত্রিশূল। অনেকে এমন যুগল মিলন, এমন অপূর্ব্ব রূপ সম্মেলনও কখনও দেখে নাই গান ভুলিয়া তাহার রূপ দেখিতে লাগিলেন। এই সন্নাসী দম্পতী কতদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারা সম্মুখে দেখিল, এক আলুলায়িত কেশা অনিন্দসুন্দরী বালিকা বা যুবতীই বুঝি প্রায় নগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া গান করিতেছে। তাহার দেহে বস্ত্রের স্পর্শ মাত্র নাই কোমরে একখানা শতছিন্ন নেকড়া জড়ান আছে, কেহ তাহা কোমরে জড়াইয়া দিয়া থাকিবে, সেও শত গ্রন্থি সম্পন্ন ছিন্ন বস্ত্র তাহার নগ্নতাকে আবরণ করে নাই বরং পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে পার্শ্বে দুইটি বড় বড় কাল কুকুর দাঁড়াইয়া আছে। উভয়েরই ব্যাদান বদন হইতে লোহিতবর্ণ লেলিহান দুই জিহ্বা বাহির করিয়া যেন হাঁপাইতেছে। কুকুর দুইটি পাগলিনীর রক্ষক, কারণ কুকুর দুইটির ভয়ে জনতার কেহই অগ্রসর হইতে পারে নাই মাঝখানে চক্রাকারে একটা শূন্যস্থান রহিয়াছে আর সেই স্থান স্বর্ণ রৌপ্য ও তামের মুদ্রায় যেন প্রায় আবৃত হইয়া গিয়াছে তখনও টাকা পয়সা পড়িতেছে, মোহরের সংখ্যাও কম নহে, পাগলিনীর সেদিকে দৃষ্টি নাই উর্দ্ধনেত্র হইয়া গান করিতেছে—কাহনা ছোড়ত নেহী কহো হাম নাথ ক্যা করী।

পাগলীর দুই চোক দিয়া জল পড়িতেছে কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে গদগদ শব্দ একেবারেই নাই। যুথিকা শুভ্র, স্বচ্ছ রক্তিমাভ দুই গণ্ডের উপর দিয়া

অশ্রুর দুইটি ধারা গড়াইয়া যাইতেছে পূর্ব্বে কিরণ সংস্পর্শে তাহা যেন মুক্তার লহরের ন্যায় চকচক করিতেছে আর দীর্ঘ প্রবল খণ্ডের ন্যায় অধরোষ্ঠের ভিতর দিয়া গানের সুরের সঙ্গে যেন লোহিত আভা ঝলকে ঝলকে বাহির হইতেছে। পাগলিনী মুক্ত করে দাঁড়াইয়া আছে, এমন ভাবে হাতজোড় করিয়াছে। মৃগল বাহার আবরণেই তাহার বক্ষস্থল আবৃত রহিয়াছে। বিস্ফারিত নয়ন দুইটির উপর সুবিন্যস্ত ভ্রমর মালার ন্যায় যুগ্মভুরু কখনও সঙ্কুচিত কখনও বিস্ফারিত হইয়া গায়িকার সজীবতার পরিচয় দিতেছে। পাগলিনী নগ্নপদ এবং চরণের দুই এক স্থানে দুই এক বিন্দু রক্ত যেন অলক্তকের স্থলে ফুটিয়া রহিয়াছে। আহা মরি মরি এমন মাধুরীও আর কেহ দেখে নাই। নয়নময় হইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে আর কণ্ঠস্বর শুনিলে—সে কানেড়ার তান শুনিলে নিমিলিত নেত্রে শ্রবণময় হইয়া স্বর-তটিনীর রব মাধুরী উপভোগ করিতে হয়।

মাঘ মাসের শীত।—প্রয়াগের শীত; পাগলিনী কিন্তু অনাবৃতা। মাঝে মাঝে কণ্ঠে ও পৃষ্ঠে স্বেদ বিন্দু দেখা দিতেছে। ইহা কি স্বেদ না সঞ্চিত শিশিরকণা? সেই জনতা এই রূপ এবং এই স্বর যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উপভোগ করিতেছিল। আর কুকুর দুইটিও অপূর্ব্ব,—দুইটিই ঘনঘোর কৃষ্ণকায় অন্য বর্ণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। লাল লাল চারি চক্ষু যেন চারিটি আগুণের সোনার মত জ্বলিতেছে, কুকুর দুটি এক একবার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পাগলীকে দেখিতেছে আর এক একবার পাগলীর চরণের শোণিত বিন্দু চাটিয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। অতি ভীষণকায়, অতি বলশালী দুই সারমেয় বটে কিন্তু একটু লক্ষ করিয়া দেখিলে—তাহাদের চক্ষের ও মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলে মনে হয় যে সারমেয় যুগলও

স্নেহমমতায় হিংসা-শূন্য, তাহারা যে কত সোহাগের সহিত কি অপার্থিব ভালবাসা ঢালিয়া এইরূপ শরীরকে রক্ষা করিতেছে তাহা যে দেখিতে জানে সেই বুঝিতে পারিতেছে। তাই জনতার একজন বলিল—করি কি! মানুষ দেখি না পশু দেখি—শুনি না দেখি, পাগলিনীর রূপ দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা করে না, কুকুর দুইটাকে দেখিলে অন্য দিকে নয়ন যায় না, কেবল দেখিবই কি? ওদিকে যে আবার সঙ্গীতের সেফালী বৃষ্টি হইতেছে তাহাও শুনিতে হয়। একি দেবতার ছলা নাকি?

সন্ন্যাসী দম্পতী জনতা ভেদ করিয়া সম্মুখে আসিয়াই থমকাইয়া দাঁড়াইল। ভৈরবী মা প্রথমেই বলিলেন—কে এ, সেই নাকি, সে এমন হল কেমন করে? সন্ন্যাসী ভৈরবীর গা টিপিয়া চুপ করিতে বলিলেন এবং নিজে যেন নয়নময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন। জনতার লোকগুলার বড় বিপদ হইল তাহারা দেখে সহসা চক্রের একদিকে এক অন্য শ্রেণীর রূপ কিন্তু—অপূর্ব্ব অতুল্য এবং নিরূপম রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ যেন চাপা সোনা গয়নাটীর যুগল মূর্ত্তিতে সাকার ও সাবয়ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাগলিনী শ্বেত ও লোহিত, সন্ন্যাসী দম্পতী পীতলোহিত। সর্ব্বচক্ষু এই দিকেই কেন্দ্রীকৃত হইল এই সময় পাগলিনী সে গান বন্ধ করিয়া হঠাৎ চপলা চঞ্চলার ন্যায় দেহ লতাকে আন্দোলিত করিয়া আর এক গান ধরিয়া দিলেন—হরি সে লাগি রহ রে ভাই তেরো বনত বনত বনী যাই। তেরী বিগড়ী বাত বনী যাই।

পাগলিনী চোখ মুখ ঘুরাইয়া একটু যেন নৃত্যের ভঙ্গী ফুটাইয়া এই গান করিতে লাগিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিতে করিতে সহসা তাহার দৃষ্টি সন্ন্যাসী দম্পতীর উপর পড়িল অমনি সব স্তব্ধ, গান স্তব্ধ,

পাগলিনী নিজেও স্তব্ধ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল কুকুর দুইটা উর্দ্ধমুখ হইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে ডাকিতে লাগিল এবং সন্ন্যাসী দম্পতীর প্রতি এক একবার তাকাইয়া পরে পাগলিনীর মুখের দিকে উর্দ্ধমুখ হইয়া ডাকিতে ডাকিতে দুই কুকুরে পাগলিনীর দুই দিকের কোমরের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া প্রায় তাহার মুখের কাছে তাহাদের মুখ লইয়া গিয়া অতি গম্ভীর জমাট আওয়াজে ডাকিতে লাগিল। এও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, জনতার সকলে ভয় পাইল অনেকে সরিয়া চলিয়া গেল তখন সুকুমার আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া দরিয়ার হাত ধরিলেন এবং অতি কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন— এ কি দরিয়া! ও আবার কেমন লীলা? সুকুমারীও একটু মুচকি হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মরণ আর কি! এ আবার কেমন ঢং! মেয়ে মানুষের কি এমন হতে আছে?"

দরিয়া। গুরুজীর আজ্ঞা। লজ্জা ছাড়িতে হইবে তাই এই কসরত। আর সে দরিয়া নাই। এখন দরিয়া দেবলা হইয়াছে। আমি ভেবেছিলাম আমায় কেহ চিনিতে পারিবে না।

সুকুমারী। পোড়ার মুখ আর কি। আগুণ পাঁশ ঢাকা থাকে? মিন্‌সেগুলা সিদ্ধ সাধকই হউক আর স্বয়ং ভগবানই হউক, মিন্‌সে ত মিন্‌সেই বটে। উহারা নারীর মান কি বুঝিবে? ছি, ছি, আমার সোণার প্রতিমাকে এমন করেছে। এমন কি করতে আছে না কি?

এই সময়ে পিছন হইতে শব্দ হইল "ঠিক বলেছ মা! মিনসেরা নারীর মহিমা বুঝিতে পারে না। দরিয়া বদ্ধাঞ্জলী হইয়াও নিজের লজ্জা ঢাকিয়াছিল। জগতজননীকেও নরকর-মালা কটিতে ধারণ করিতে হইয়াছে। ঠিক বলেছ মা, মিনসেরা নারীর মহিমা বুঝিতেই পারে না। শিব পারেন

নাই, শ্রীকৃষ্ণ পারেন নাই অন্যে পরে কা কথা।" সুকুমার ও সুকুমারী উভয়েই মুখ ফিরাইয়া দেখিল গুরুজী, তৎক্ষণাৎ উভয়ে যুগলে প্রণাম করিল।

গুরুজী। তোমরা কখন এলে। যখনই এস চল আমার আস্তানায়। ঐ গঙ্গা পারে ঐ ঝুশীতে আমার গুহায় গিয়া থাকিবে, বেশ সরস জায়গা শীত লাগিবে না। দরিয়া আমার কাছেই আছে। এই সময়ে দরিয়া কেমন একটা দৃষ্টি করিয়া সুকুমারের দিকে তাকাইল, সুকুমার দেহের গৈরীক উত্তরীয় খানি তাহাকে দিল। দরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাই পরিল এবং হাসিয়া বলিল, রাম বাঁচিলাম। এস দিদি আমাদের বাড়ি এস।

সুকুমারী। তোমাকে খুঁজিবার জন্যই ত প্রয়াগে আসা। ভোরে স্নানের সময় গানের আওয়াজ পাইয়াছিলাম তার পর আড়াই দণ্ডকাল সেই স্বরের অনুসরণ করে করে তবে ধরেছি।

দরিয়া। পাগলকে কি ধরা যায় দিদি? তুমি গেরস্তর মেয়ে কিনা তোমার কথা ও ভাষা সবই গেরস্তর মতন। চল যাই।

কুকুর দুইটা নামিয়াছে, একটা আগে একটা পিছনে অবনতমুখে দাসানুদাসের মত দরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিল তাহাদের পশ্চাতে গুরুজী, সুকুমার ও সুকুমারী চলিলেন। সেই মহামেলায় সন্ন্যাসী ফকীর রাজা মহারাজা যাহাদের নজরের সম্মুখে ইহারা পড়িয়াছিল সবাই একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে। কারণ এমন ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরাতন কথা।

দরিয়া। দিদি এবার একটু কষ্ট পেয়েছি। পাগলী সেজে গাঁয় গাঁয় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, আর গান শোনাতে হয়েছে। খাওয়া দাওয়া যৎ-সামান্য কোনও দিন পেয়েছি—কোনও দিন পাই নাই। টাকা পয়সা কাপড় বস্ত্র স্পর্শ কর্‌বার হুকুম ছিল না, নষ্ট দুষ্ট লোকেই সে সব সংগ্রহ করেছে। আমার দেহ দেখেই ত বুঝতে পারছ কেমন কষ্ট পেয়েছি।

সুকুমারী। কষ্ট না পেলে কি সুখের মূল্য জানা যায়। খাওয়া পরার কষ্টের জন্য আমি ভাবি নে, অমন যে পোষাক করে' তোকে পাগলী সেজে বেড়াতে হত ঐটেই আমার বড় বুকে বেজেছিল। মিন্সে গুলো পণ্ডিত হয়েও মূর্খ, মেয়ে মানুষ না মলে মেয়ে মানুষের লজ্জা যায় না। এই সোজা কথাটা মিন্সেগুলো বুঝতে পারে না।

দরিয়া। না দিদি ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় আমাকে একটু গামছা নেংড়ান গোছ নিংড়ে নিলে। অনেক দিন সুখে খেয়ে পরে থেকেছি। একটু রস হয়েছিল বোধ হয় সেই রসটুকু বার করে দিলে, তাছাড়া অনেক জিনিষ শিখেছি। পুরুষগুলো আমাদের কি চোকে দেখে তা ঠিক বুঝেছি। তুমি সেই আগে বলতে—"প্রাণ তোমার এ ভালবাসা যেন মোছলমানের মুরগী পোষা" ঠিক তাই গো তাই।

সুকুমারী। এত কোরে তোর সেই আক্কেলটা হোল? তা হবেই বা কোথা থেকে—পুরুষ মানুষের কাছে মানুষ হয়েছিলি। মরুভূমির কোনও

এক নির্জ্জন ওয়েসিসে কাটিয়ে দিয়েছিলি তার উপর তোদের দেশের কি যে ভঙ্গী তা ত জানি না. কাজেই আমাদের দেশের মত হতে গেলে একটু গামছা নিংড়ানর মত নিংড়ে নিতে হয় বইকি।

দরিয়া। আর কথাটা ঢেকে দরকার নেই বলেই ফেলি, সেনুমী আমার বাপ নয়, অর্থাৎ জনক নহেন, কত বয়স থেকে যে তাঁর কাছে ছিলাম তা আমার মনে নেই। উনি উত্তর আফ্রিকার এক মুসলমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একজন মাতব্বর পুরুষ। জাহাজ ডুবী মানুষদের রক্ষা করাই ওঁদের কাজ, আশ্চর্য্য এই অতি দূর দূরান্তর মরুভূমিতে থাকিলেও কবে কোথায় ঝড় হচ্ছে, কারা ডুবছে, কোন জাহাজ কোথায় গিয়ে এসে ঠেকেছে এ সব আর ওরা বেমালুম টের পায়। তা ছাড়া হাবসীদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারও ওদের একটা কাজ। আমি মোছলমানের মেয়ে নই। গুজরাটের এক ব্যবসায়ী স্বামী স্ত্রী আমাকে লইয়া ইটালী হইতে আসিতেছিল। উত্তর আফ্রিকার এক তটের কাছে জাহাজ ডুবী হয়, মাগী মিন্সে নাকি মরে যায়, আমি বালির উপর পড়ে কাঁদছিলাম, আমার পরিচয়ের নিদর্শন নাকি সেনুমীর কাছে আছে।

সুকুমারী। বটে! আমারও তাই মাঝে মাঝে মনে হত কেমন একটু এদেশী ঢং তোতে আছে! তা বাবা মার খোজ করিস্‌নে কেন?

দরিয়া। কে বা বাপ, কে বা মা! নাম ধাম কিছুই ত জানি নে খোঁজই বা করব কি। তবে বোম্বাই থাকতে একটু চেষ্টা করেছিলাম, সেনুমী তা টের পেয়েছিলেন ও বলেছিলেন এ সময় ও সব ভাবনা ভেব না। কাল পূর্ণ হলে আমি সকল কথাই বলব, আর সে পক্ষে খোঁজ করবারও বড় বেশী কেউ নেই।

সুকুমারী। সেনুষী লোকটা কে তা জানিস ?

দরিয়া। উনিও মিশরের নহেন। ঠিক খাঁটি মুসলমান কি না তাহাও বলিতে পারি না। কখনও নেমাজ পড়িতে ত দেখি নাই। লোকে বলে উনি সুফী এবং ভারতবর্ষের লোক। আফ্রিকার সেনুষীদলে উনি হিন্দষী বলিয়া পরিচিত। ইহা ছাড়া আর কিছুই জানি না।

সুকুমারী। আমার ত একটা কুল কিনারা লেগে আছে। ছেলে মানুষ করা আমার কাজ; যিনি স্বামী, তিনিও তথৈবচ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যাহ'ক আমি এদের সেবা করে যত্ন করে দিন কাটাইতে পারি। আমার ভাবনা তোর জন্যে। কেবল টোপা পানার মত ভেসে বেড়াচ্ছিস, বয়স বাড়ছে ছাড়া কমছে না ত। আখেরের ভাবনা ভাবতে হয়।

দরিয়া। আমার ও সব ভাবনা নেই। তোমাদের কথাতেই বরং একটু আধটু ভাবনা হয়। ঘর গেরস্থালীত করি নাই। আর ভেবেই বা করব কি ? যাদের হাতে পড়েছি তারা যা করিবার তাই কচ্ছে।

সুকুমারী। আমার মাথা খাস একটি সত্যি কথা বল। কর্ত্তার উপর তোর নজরটা এখনও আছে নাকি ? সে ভাবটা এখনও চাপতে পারিসনি, কেমন না ?

দরিয়া। মরণ আর কি ? সতীন ঘর করতে বড় সাধ হয়েছে নয় ?

সুকুমারী। সত্যই একটু সাধ হয়েছে। যদি মিনসের একটু রুচি বদলায় সেই আশায় তোকে চাই।

দরিয়া। নিজে মেয়ে মানুষ হয়ে ও কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে কেন ? ও রোগ একবার হলে কি আর যায়, ও যে শূল বেদনার সামিল কিন্তু গুরুজীর চিকিৎসায় বেদনা অনেক কম হয়েছে। আবার দেখাদেখি হল

বাড়াবাড়ি হবে কি না বল্‌তে পারি না। হ্যাঁ দিদি হাবসী কোথায়? তাঁর মানুষটিকে ত এখানে প্রায়ই দেখতে পাই।

সুকুমারী। সে খবর আমাদের নিতে নেই রে নিতে নেই। কি বলব বোন মায়ের পেটের ভাই, ভাজ, এমন স্বামী—ঘর সংসারের এত সুখ আর ত কারুর হয় না, কিন্তু আমি পেয়ে হারিয়েছি—থেকে নেই।

দরিয়া। শুনলাম হাবসী নাকি উত্তর খণ্ডের কোন তীর্থে আছে। কি কচ্ছে ভাই? আমাদের সকলকে কি শেষে বুড় করে তবে ছেড়ে দিবে।

সুকুমারী। কে জানে বোন অত শত ভাবি নে, ভাবতে পারিও নে। এখন কলের পুতুলের মত যা করবার তাই করে যাচ্ছি। কর্তার খেয়াল হল কুম্ভমেলায় আসবেন। খেয়াল হল যুগলে কল্প বাস কর্ত্তে হবে তাই এসেছি। এর মধ্যে যে তোর খোঁজ করার অভিসন্ধিটা ছিল তা গোড়ায় বুঝতে পারি নাই। তা এখন দুজনে এক ঠাঁই হয়েছ বুঝা পড়া করে নাও।

দরিয়া। বলেছি ত আমায় নিংড়ে নিয়েছে। কেমন একটা অবসন্নতা আমার এসেছে। আবার কদিন ভাল খেলে পরলে কি হবে কে জানে। তবে মনের উপর একটা ভারী দাগ পড়েছে। পুরুষগুলার মন্দ দিকটা বড়ই দেখেছি তাই পুরুষের হাতে আর আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছে করে না। দেহ ছাড়া ওদের আর অন্য দিকে দৃষ্টি নাই। ভাগ্যে গুরুজী সঙ্গে দুটো কুকুর দিয়েছিলেন তাই জান মান রক্ষা করে আসতে পেরেছি। তারপর বুঝেছি—শুধু কুকুর কেন কর্ত্তা নিজেও এবং সময়ে সময়ে বিশ্বস্ত শিষ্যশাখা নিযুক্ত করিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে দূরে দূরে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেন। সেও ত বড় কম মেহন্নত নয়, কেন কল্লে ভাই?

সুকুমারী। এই সন্ন্যাসীগুলোও এক অদ্ভুত জীব, কি যে করে কি

যে বলে তার হদিসই পাইনে, শুধু কি এরাই, এমন অনেক দল সন্ন্যাসী আছে বাঙ্গালা দেশের অনেক গৃহস্থ পরিবারকে এমনি ভাবে গ্রাস করে বসে আছে। একজন ত স্ত্রী নিয়ে বৃন্দাবন বাসই করেছেন। ধন, ঐশ্বর্য্য, জমিদারী, ওকালতী, বার সব ছেড়ে দিয়ে স্বামী স্ত্রী শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী করে খাচ্ছেন। এমন কি একটা, হাজারটা এই রকম হয়েছে। কেউ বৈষ্ণব কেউ শাক্ত, কেউ নানকপন্থী গুরু নিয়ে নানা ঢংএ দিন কাটাচ্ছে। আমরাও সেই রকম এক পাল্লায় পড়েছি। তবে আর হবে কি? মেয়ে মানুষ পুরুষের বাঁদী যা বলবে, যেমন কর্ব্বে তেমনই থাকতে হবে।

নমো নারায়ণায়। এই উক্তি করিয়া খড়মের খটমট শব্দ করিতে করিতে স্বামিজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—"মা এই মাত্র কাশী থেকে এলাম, কাল অমাবস্যার স্নানটা করতে হবে তাই আসতে হল। তোমাদের সব কুশল ত? আর একজন সঙ্গে এসেছে এই দেখ।" দশ বারটি সন্ন্যাসীর ছেলের সঙ্গে তেমনি গৈরিক পরিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া লাঠি ও খড়ম লইয়া নন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সবাই মা বলিয়া আসিয়া সুকুমারীকে ঘিরিয়া বসিল। ইহারা নন্দের সহপাঠি, সহতীর্থ, নন্দ উহাদের সর্দ্দার পড়ো, তাই নন্দের মাকে উহারা মা বলে এবং কখনও কখনও নন্দের সহিত উহাদের বাড়ীতে আসিয়া পায়স পিষ্টকাদি খাইয়া যায়। স্বামিজী একটু যেন ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন। গঙ্গা তখন ঝুশীর নীচে দিয়াই বহিতেছিল, ছেলেদের সঙ্গে লইয়া তিনি তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী উঠিয়া কক্ষান্তরে যাইয়া পাকের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ছেলে আসিয়াছে মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন। মা অন্নপূর্ণা সাজিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। প্রায়ঃ

আড়াই দণ্ড তিন দণ্ডের পর স্বামীজি ছেলেদের লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিলেন। আহারাদির পর অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত অমাবস্যার উষাস্নান কোনখানে করিবেন তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দরিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, নন্দর আহা-রাদির পর তাহাকে কোলে করিয়া গান শুনাইবার লোভ দেখাইয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেল এবং আপন মনে বলিতে লাগিল,—উঁহু আরও কিছু আছে এ কেবল স্নান নহে, একটা কি জটলা চলছে, দরিয়ার চোখ এড়িয়ে কিছু কর্ত্তে পারবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমাবস্যার স্নান।

রাত্রি তিনটা হইতে একটা যেন কেমন কলরব উঠিল। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনি শেষ রাত্রের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া কেমন একটা আরাবের সৃষ্টি করিল। ঝুশীর গুকায় সন্ন্যাসীরাও উঠিলেন, দরিয়া তাহার দুইটি কুকুরকে ডাকিয়া লইল, একটি কুকুরের ঘাড়ে নন্দ চড়িয়াই বসিল। সুকুমারীও প্রস্তুত হইলেন সবাই আসিয়া জুটিল, সুকুমারও সোফা হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন। সন্ন্যাসীরা তিনখানি নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন, তিন খানিতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক বসিয়া সঙ্গমের দিকে ভাটির টানে ভাসিয়া গেলেন। দণ্ডেক কালের

মধ্যেই তাঁহারা সঙ্গমের ঠিক অপর পারে গিয়া দাঁড়াইলেন এই খানেই ভিন্ন প্রবাহা যমুনা আরম্ভ। দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনার কাল জল স্পষ্ট রহিয়াছে আর উত্তর পূর্ব্ব দিয়া তরঙ্গ ভঙ্গময়ী কুল-কুল, কল কল ছল ছল শব্দময়ী গঙ্গা সবেগে চলিয়াছে। গঙ্গার দিকে জল কম, এক হাঁটু এক কোমরের অধিক হইবে না, যমুনার দিকে অগাধ জল কিন্তু স্রোত বা শক্তির কোনও লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সন্ন্যাসীগণ একে একে সবাই গঙ্গার জলে নামিলেন, স্বামীজি দরিয়া ও সুকুমারীকে হাত ধরিয়া নামাইলেন, এবং প্রত্যেককে বলিয়া দিলেন, "যমুনার দিকে পা বাড়াইও না, অগাধ জল এবং বড় ঠাণ্ডা জল। কেবল তাহাই নহে যমুনায় কচ্ছপও অনেক, কুম্ভীরও আছে। আমি সঙ্গমের জল কমণ্ডলু করিয়া তুলিয়া তোমাদের মাথায় ছিটাইয়া দিব তাহাতেই সঙ্গমের স্নান হইবে তোমরা আর বেশী আগাইও না। তাহার উপর আজ অনেক দেশের, অনেক রকমের লোক নৌকা করিয়া স্নান করিতে আসিয়াছে তাহাদের সকলের মতিগতি কিছু ভাল নয় তোমরা একটা করিয়া ডুব দিয়া নৌকায় গিয়া উঠিয়া বস এবং সেইখানেই বসিয়া জপ করিও।" চারিদিক হইতে সহসা শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ উঠিল হর হর মহাদেব ব্যোম ব্যোম, সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনী সংকীর্ত্তন যেন জল স্থলকে শব্দময় করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই সময় পূর্ব্ব দিকে একটু লাল আভা দেখা দিল ঠিক ব্রহ্মলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া স্নানের ধুম পড়িয়া গেল। প্রথমেই নাগা সন্ন্যাসীর দল, সিপাহি পরিবৃত্ত হইয়া আসিল, তাহারা এক একটা ডুব দিল এবং গায়ের জল না মুছিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। নগ্নকায় দীর্ঘ বপু পুরুষ গামছা কাপড়ের সম্বন্ধ নাই, ডুব দেয় আর উঠে, সুতরাং তাহাদের স্নান শীঘ্রই হইয়া গেল তাহার পর একে একে

সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সাধু দলে দলে আসিয়া স্নান করিল। সর্ব্বশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আসিল ইহাদের সঙ্গে খোল করতাল সিঙ্গা আর সংকীর্ত্তন, সে স্নানের বাহারই কত। গুরুজী এই সময় নৌকা হইতে নামিয়া স্নান করিলেন, ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনিও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ভুক্ত। স্নান দান শেষ করিতে বেলা প্রায় আটটা হইয়া গেল, তাহার পর সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরিলেন উজানে যাইতে হইল কাজেই আধ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিতে দুই ঘণ্টা লাগিল। বাড়ী ফিরিয়া দেখেন পর্য্যাপ্ত কচুরী, মোহনভোগ, ক্ষীর, রাবড়ী, সঞ্চয় করা রহিয়াছে, কে একজন শ্রেষ্ঠী দিয়া গিয়াছে। অমাবস্যায় অন্ন ত কেহ খাইবে না তাই নিঃশব্দে এক দাতা সন্ন্যাসীর সেবার খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছে। সে প্রায় শতাধিক লোকের খাদ্য ইহারা কে কত খাইবেন; সুকুমারী অনেক খাবার সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। এমন সময় দশ পনের জন শিষ্য সমেত অঘোরী বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পিছনে পিছনে সেনুগাঁও নিন্দায়তদের সাজে সজ্জিত হইয়া শিষ্য সহ আসিয়া হাজির হইলেন। যাহা ছিল তাহাতেই সকলের পর্য্যাপ্ত হইল। দরিয়া এ সকল দেখিয়া শুনিয়া সুকুমারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দিদি আমি কাল রাত্রেই বলেছিলাম এ কেবল স্নান কর্ত্তে আসা নয়, এ একটা জটলার বন্দোবস্ত।"

সুকুমারী। চুপ কর পাগলী। এ সব পুণ্যাহ ত জটলার জন্যই হয়ে থাকে, তাতে তোরই বা কি আমারই বা কি।

দরিয়া।—কে জানে বোন আমার যেন একটু কেমন কেমন বোধ হচ্ছে।

সুকুমারী।—কি আর নূতন হবে যা হয়েছে তার বাড়া ত হতে পারে

না। ছিলাম মায়ের বড় আদরের মেয়ে, শাশুড়ীর বড় সোহাগের বৌ, স্বামীর আদরও বড় কম পাইনি। সেই স্বামী উচক্কা হয়ে বিলেত গেল, একে একে মা ও শাশুড়ী কাশীলাভ করলেন, আমাকে নড়া ধরে কত জায়গায়ই ঘোরালে, কোলের ছেলেকে ছেড়ে কত স্থানেই রহিলাম তার পর হারান স্বামী পেলাম বটে সেত নাম মাত্র। শেষে এই দশা, আর নূতন কি হবে গো ?

দরিয়া।—তোমার ভাগ্যে কিছু হোক না হক আমাকে নিয়ে মিনসেরা আর একটা নূতন খেলা খেলতে পারে। দেখছনা যার কথার উপর কথা নেই সেই সেনুমী পর্য্যন্ত এসে হাজির। এদের পরামর্শ সভায় থাকতে হবে, অন্ততঃ ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তা জানতে হবে।

—"জানবে বৈকি ? তোমাদের জানবার জন্যেই আমরা এসেছি কিছু ঢাকবো না কিছু লুকুব না। এই বলিয়া অঘোরী বাবা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসি সামলাইয়া আবার দরিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন পাগলী অত চালাক হ'সনে। আমরা সব জানি সব বুঝি। তোর মত আর নেই আর পাব না বলেই একটু চেষ্টা করে দেখছি, চঞ্চল হোস না।

দরিয়া।—না চঞ্চল হইনি বাবা একটু অরুচি হয়েছে।

অঘোরী বাবা।—দেখনা কেমন রুচি করে দিই। তখন আর ছাড়তে চাইবি নি।

দরিয়া।—বটে ! এই বলিয়া হাত মুখ নাড়িয়া—"নব নব রে নিতুই নব" এই কীর্ত্তনটা গান করিল বাবাজী মন দিয়া গানটী শুনিলেন এবং শেষে বলিলেন, "না আর বিলম্ব করা কিছু নয় শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। বৈষ্ণবগুল কেবল টেনেবুনে বাঁধে, এই যা দোষ, ওরা নারীর মধ্যে জননীর

ভাবটা একেবারে দেখতে চায় না, পাগলীর মা হইবার সাধ হইয়াছে এ সাধের মুখে কি বালির বাঁধ দেওয়া চলে। মেয়েটাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করলে, সুকুমারীর মত খাসা মায়ে পরিণত হইত, দেখা যাউক কতদূর ঘটে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

—"শোন দরিয়া, এখনও সময় আছে, এখনও আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তে পারি এস দুজনে পালাই।" অন্ধকারে ভাঙ্গা গলায় যেন কোথায় কোন দূর হইতে অন্ধকার ভেদ করিয়া এই কথা কয়টি ফুটিয়া উঠিল! —"শোন শোন এখনও শুন। পারি যদি এখনও আমিই পারি! এস।" আবার এই কয়টি কথা ফুটিল, কে বলিতেছে জানি না কিন্তু আওয়াজ উঠিতেছে, আবার সেই শব্দ।

—"তোমার জন্য আমি সব করেছি, মানুষের অসাধ্য সাধন করেছি। ছায়ার মতন তোমাকে অনুসরণ করেছি, এস, এস! আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে সমাদরে রাখবো।" আবার এই কয়টা কথা গিরিগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া সে সূচীভেদ্য অন্ধকারকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সমুত্থিত হইল।

দিবস অতীত হয় নাই, অমাবস্যার পর প্রতিপদের অন্ধকার তাহার

উপর মাঘমাসের কুজ্ঝটিকা গঙ্গা যমুনার গর্ভ হইতে যেন স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া আকাশের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিতেছে—যেন কতকটা স্পর্শযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। মাঘ মাস, মাঝে মাঝে একটু উত্তরে ও পশ্চিমে হাওয়া উঠিয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। সে ঝুশীর পাহাড় হইতে দেখিলে বুঝা যায় না গঙ্গা যমুনার চড়ার উপরে লক্ষ লক্ষ নরনারী শুইয়া আছে। সব নিস্তব্ধ, এমন কি দূর গ্রামের সারমেয় শব্দও শোনা যাইতেছে না। অতি শীতে শৃগাল কুকুরেও রব করা বন্ধ করিয়াছে। এমন ভয়ানক অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভয়ানক হাড় ভাঙ্গা শীত এলাহাবাদেও কদাচিত ঘটে। এই সময় ঝুশীর ভিতর এই শব্দ হইল। গুহার মধ্যে দরিয়া আছে নাকি, নহিলে দরিয়ার নাম উচ্চারিত হইবে কেন? শব্দ হইল, কিন্তু শব্দের উত্তর পাওয়া গেল না। ক্রমে বোধ হইল অন্ধকার ঠেলিয়া সেই গুহার সকল অন্ধকারকে নরাকারে পরিণত করিয়া যেন একটা কাল মানুষের ছবি স্পষ্ট হইয়াছে। সেই অন্ধকারময় মানুষরূপ আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া মেঝের উপর বসিল এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কাহাকে খুজিতে লাগিল।

"কৈ! এখানে ত নেই কোথা গেল? বাবাজী সরিয়ে ফেললেন নাকি?"

"হা! হা!! হা!!!" ভূমিগর্ভস্থ পর্ব্বত কন্দরকে উৎকটভাবে আলোড়িত করিয়া একটা অট্টহাস্য হইল। আবার সেই হাস্য—হা! হা!! হা!!! গম্ভীর ঘনঘোর নির্ঘোষের মত, সিংহ গর্জ্জনের মত এই হাসি তিন চারিবার উত্থিত হইল মনে হইল সে হাসির প্রতিধ্বনি লহরে লহরে বিস্তারিত হইয়া অপর পারে আকবর বাদসার ভীমদুর্গ প্রাচীরে আঘাত করিতে লাগিল।

"কে হাসে?" যে মানুষটা উবু হইয়া অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া খুঁজিতেছিল সে যেন মুখ জুবড়াইয়া শুষ্ক কুট্টিমে উপুড় হইয়া মিশাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

"হা! হা!! হা!!!—বিজয় বর্ণচোরা আম হয়েছে। সে যে দেব-প্রয়াগে তোমার আশায় বসে আছে। আর দরিয়া সে ত তোমায় চায় না। তোমার এ রুচি হইল কেন? জান এ সহরে আর কেউ নাই? জান সব স্থানান্তরে চলে গিয়েছে! তা জান না? আর দরিয়াকে নিয়ে পালাবার অভিসন্ধি করছ! এই তোমার বুদ্ধি?"

"রক্ষা কর। তুমি যে হও ভূত হও প্রেত হও পিশাচ হও। আমার অপরাধ হয়েছে আমায় রক্ষা কর। ঠাকুর আগুনের সঙ্গে খেলা করবার জন্য আমাদের মত বিষয়ীকে কি ছেড়ে দিতে আছে। আমি যে এতদিন সামলে আছি এই আমার বড় বাহাদুরী। হয় আমায় মেরে ফেল নয় আমায় সামলাও, রক্ষা কর।"

"সত্যি কথা বলেছিস শুনে সুখী হলাম। যেখানে আছিস সেইখানেই শুয়ে থাক, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গুহা ত্যাগ করিস্‌নে।"

গিরি গহ্বর স্তব্ধ হইল শব্দশূন্য হইল—দূরে গঙ্গার তটে চিতাবহ্নী বিকাশের মত, যেন শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে অন্ধকার সে কুয়াসা ঠেলিয়া বহ্নী যেন উপরে উঠিতেই পারিতেছে না তবে আগুনটা যে খুব বড় আগুন তাহা জ্বালা মালার কতক বিস্তারে বুঝা গেল। দপ্‌ করিয়া আর একটা আগুন ঐ রকম জ্বলিল। 'Bon fire' জ্বলিলে যেমন আগুণ হয় তেমনি দপ্‌ দপ্‌ করিয়া দশ পনেরটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল আর সেই পনের কুড়িটা ধুনীর জ্বালা

মালায় দেখা গেল প্রায় পাঁচশত সন্ন্যাসী সাধু ফকির সেখানে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। সবাই সেই বালির চড়ার উপর বালুকার আসনে বসিয়া আছেন। মাঘ মাসের শিশির এই ধুনীর তেজে যেন কতকটা মন্দীভূত হইল, হাতে হাতে হাতে প্রায় পনের কুড়িটা গাঁজার কলিকা চলিতে লাগিল, অনেকে গঞ্জিকার ধূম গ্রহণ করিলেন, অনেকে করিলেন না তাহার পর অতি গম্ভীর আওয়াজে চার পাঁচজন সন্ন্যাসী মিলিত কণ্ঠে---

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষী ভূতং॥
একং নিত্যং পরমনিস্কলং তত্ত্বমস্যাদিরূপং।
নিত্যানন্দং পরমমৃতং সদগুরুং ত্বং নমামি॥

এই বলিয়া গুরু প্রণাম করিল, সকলেই উঠিয়া প্রণাম করিলেন কেবল জুটাজুট ধারী, বিভুতিভূষণ, এক নগ্ন পুরুষ আসনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সুগৌর বর্ণ, দীর্ঘ উন্নত ললাট, পিঙ্গল জটার ভার, তাহা পাকাইয়া পাকাইয়া কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত লোচন, সে দুই লোচনের প্রায় অর্দ্ধেকটা ভ্রূ সমেত কপালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়া যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে, আজানু লম্বিত বাহু, পদ্মাসনের উপর যুগল-বাহুর করাংশটা যেন লতার মত এলাইয়া আছে। ক্রমে ইনি হাত দুইটি তুলিয়া, ঝোলা-প্রায় অংশটুকু উপরে তুলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। বড় ড্যাবডেবে পটল চেরা চোক, সেই দুই নয়ন হইতে বিদ্যুতের দীপ্তির মতন যেন দুইটী জ্যোতিঃ রেখা সমবেত সাধু সন্ন্যাসী মণ্ডলীর উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল। সকলেই অবনত মস্তকে রহিলেন, মণ্ডলী মধ্যে আমাদের পরিচিত সকল সন্ন্যাসীই ছিলেন, তাহা ছাড়া

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বড় বড় দিকপাল সন্ন্যাসী ও আকড়াধারিও ছিলেন, সেই ঋষি-প্রতিম, অতি জীর্ণ কলেবর মহাপুরুষটি জলদগম্ভীর স্বরে হিন্দি ও সংস্কৃত মিশ্রণে একটা অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়া গোটাকয়েক কথা বলিলেন !—

"আমাদিগকে একটু প্রচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। তোমরা যাহারা দেহভারে একটু পীড়িত বোধ করিতেছ তাহারা দেহ রাখিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করিতে পার। আচার ধর্ম্মতত্ত্ব, আর প্রবল রাখিলে চলিবে না, পূর্ব্বেকার মত শুদ্ধ সত্ত্ব, সুসংস্কৃত ব্রাহ্মণ দেহ আমরা পাইতেছি না কাজেই ও ভাবে চলিলে চলিবে না, যে সকল অস্ত্র তোমরা সংগ্রহ করিয়াছ তাহা টিকিবে না। অনেকগুলি বিগড়াইয়া যাইবে, যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই। যেটুকু কাজ তাহারা করিয়া যাইবে তাহাতেই সকলের কল্যাণ হইবে। সঙ্কলনের কাল সম্মুখে, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে হইবে। তা তোমরা যে যেমন করিয়া পার, এই ভাঙ্গিবার কাজ করিতে থাক। বাঙ্গালা অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে আরও ভাঙ্গিবে, রোধ করিতে পারিবে না, তাই মণ্ডলীর হিসাবে বাঙ্গালার কাজ করিলে চলিবে না। এক একটা গৃহস্থ ধরিয়া যে কাজ করিতেছ তাহা ঠিকই হইতেছে। আরও দুই চারি জন দুচারি সম্প্রদায়ের কথা লইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ কর। নানকের মতটা প্রচার কর—কল্যাণ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও একটু চাগাইয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালা গঙ্গার পলি মাটির দেশ ওখানে কঠোর সাধনা স্থায়ী হইবে না, তন্ত্র সাধনা তাই লোপ পাইয়াছে। বৈষ্ণবেরও কঠোর সন্ন্যাস আর তেমন প্রকট নাই, প্রবৃত্তির পথ দিয়া বাঙ্গালাকে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে, ইয়োরোপের সভ্যতার ও বিদ্যার জলুষ বেশী দিন টিকিবে না, উহা আপনা

আপনিই ফাঁসিয়া যাইবে, অভাবের তাড়নায় বাঙ্গালীকে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু একসূত্রে তিনটে দেশকে গাঁথিতে হইবে—বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাব। অঘোরনাথ তুমি বাঙ্গালায় যাহা করিতেছ তাহাই কর, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের ব্যবস্থা স্বতন্ত্ররূপে করিতেছি। নূতন কথা কিছু বলিবার নাই ইহার পর তৃতীয় পূর্ণকুম্ভে, অনেক নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিবে, তখন সনাতন সৎ ধর্ম্ম সিদ্ধান্ত বাঙ্গালায় আপনা আপনি গজাইবে, যে পথে পূর্ব্বে সমীকরণ হইয়াছিল তথাগতের সেই ধর্ম্মেই আবার সমন্বয় ঘটাইতে হইবে। আমাদের দ্বারায় সব কাজ হইবে না, অবস্থার গতিকে অনেক কাজ আপনিই হইয়া যাইবে, অধীর হইও না, সুদিন শীঘ্রই আসিবে। যাহাদের একটু চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে তাহারা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পার।"

তখন একজন সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি এক দম্পতী সাধক পাইয়াছি, আমার বৃন্দাবনের আসন তিনিই সজীব রাখিবেন এবং তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালার অনেকটা কাজ হইবে। আমার প্রতি যদি কৃপা হয় তবে আমি 'তোলা' ছাড়িতে পারি।

মহাপুরুষ। বেশ কথা। তোমাকে পরে এ সম্বন্ধে সকল অভিসন্ধি বলিয়া দিব।

আর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ উঠিয়া বলিলেন—"আমার কাজ অনেকটা হইয়াছে। পঞ্জাবে যুক্তপ্রদেশে এবং অযোধ্যায় আর্য্য সমাজের ভঙ্গী বেশ ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার মধ্যে ভারতের সনাতন বিশিষ্টতা কতক কতক ফুটিয়া উঠিতেছে, অনুমতি হয় ত আমিও এ হীন বস্ত্র পরিহার করি।"

মহাপুরুষ। উহুঁ এখন নয়। বিলাতী পর্দ্দা আর একটু সরাইতে হইবে।

এইবার আমাদের পরিচিত গুরুজী উঠিয়া বলিলেন, ঠাকুর আমার প্রতি কি অনুমতি হয়, আমার মনে হয় আমি যে পন্থা ধরিয়া আছি তাহা এখন কিছু কালের জন্য চলিবে না। স্খলিত-বীর্য্য নরনারী—ইহাদের একঠাঁই করিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিলেই প্রমাদ ঘটিবে। ঘটিতেছে ত তাহাই, তজ্জন্য আমি বেদনাও পাইতেছি, বলেন ত রূপ বদলাইয়া আসি।

মহাপুরুষ। তুমি আমার সঙ্গে চলিও দেব প্রয়াগে যাইয়া আমি সকল কথা তোমায় খুলিয়া বলিব। এই বলিয়া মহাপুরুষ কাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এদিকে এস", অমনি ধীর পদবিক্ষেপে সুকুমার ও সুকুমারী মহাপুরুষের সম্মুখে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তখন তিনি সুস্পষ্ট বাঙ্গালা ভাষায় বলিলেন,—"মা হয়ে থাক মা। মায়ের দেশ বাঙ্গালায় মায়ের অভাব বড়ই হয়েছে। বাঙ্গালাই আমার ভবিষ্যতের ভরসা—এইবার বাঙ্গলারই পালা। গোটাকয়েক মা না গড়িতে পারিলে সে পালা জমিবে কেমন করিয়া।" এই বলিয়া মহাপুরুষ সুকুমারী ও সুকুমারের মাথায় বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আবার তিনি বলিলেন, প্রদেশ প্রদেশ ধরিয়া আমরা গুরু পরম্পরায় ভারতবর্ষকে আবার নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজপুতানার রাজপুতগণ প্রথমে ধর্ম্মের দর্পে নষ্ট হইল, তাহারপর মোগলের সংস্পর্শে চূর্ণ হইয়া গেল। রামানন্দস্বামী ভাল অস্ত্র পাইয়াছিলেন। শিবাজীর সাহায্যে মহারাষ্ট্র দেশ সজীব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই দোষে মহারাষ্ট্র নষ্ট হইল, শিবাজী সৎপুত্রের পিতা হইতে পারিলেন না, তাহার পর ব্রাহ্মণ বিলাসী হইয়া সব মাটি করিল। শেষে কামরূপের তান্ত্রিক সদানন্দ গোবিন্দ সিংহকে পাইয়া তন্ত্রের শক্তি সাধনার সঞ্জীবন মন্ত্র নানকের বৈষ্ণব ধর্ম্মে

অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন, গুরুগোবিন্দ শিখজাতির সৃষ্টি করিলেন। অনেক কষ্ট সহিয়া অনেক কাঁচা মাথা হেলায় দিয়া শিখজাতি গজাইয়া উঠিয়াছিল কেবল বিলাসের হলাহলে তাহারা ঝরিয়া পড়িল। এইবার বাঙ্গালার পালা। সব ভাঙ্গিয়া সকল বৈষম্যের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া চুর্ণিত বিধ্বস্ত বাঙ্গালার উপাদানে একটা নূতন জাতীর সৃষ্টি করিতে হইবে। জমী তৈয়ার হইতেছে, স্থানে স্থানে বীজ ছড়ানও হইতেছে। এখনও রোয়া বোরা চাষ আবাদ শেষ হয় নাই। পরে ফসল হইবে শেষে ফল পাইবে। খুব কম করিয়া হিসাব ধরিলেও শতাব্দী কাল এই চেষ্টায় অতিবাহিত হইবে। আমি সূচনা করিয়া যাইতে পারিব পরে অন্তে আসিয়া ফসল কাটিবে। এ জীর্ণ পুরাতন শুষ্ক দেহ আর চলে না, দেহ রাখিব তাহার পর পঁচিশ বৎসর কাল তোমাদিগকে একটু স্তব্ধ ভাবে থাকিতে হইবে। ইংরেজি হিসাবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারের ও ফসল কাটার কাজ আরম্ভ হইবে তখন আমি, দয়ানন্দ তুমি, রামানন্দ, কাশীর তৈলঙ্গ, তুমি অঘোরনাথ, আমরা নূতনরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। তাই বলিতে আসিয়াছি এইবার দেহ রাখ এবং নূতনরূপে আসিবার আয়োজন কর। ইহা ছাড়া নূতন বার্ত্তা আমার নাই। মহাপুরুষের বাক্যও শেষ হইল আর পূর্ব্বদিকে একটু যেন ফরসা হইয়া উঠিল অমনি সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত প্রত্যেকে চিমটার আওয়াজ করিয়া দলে দলে কে কোন দিকে চলিয়া গেলেন। প্রয়াগের দ্বাদশ বার্ষিকী পরামর্শ সভা শেষ হইল। এমন সন্ন্যাসীর সভা হরিদ্বারে, নর্ম্মদা তীরে, প্রয়াগে এবং সাগর সঙ্গমে বার বৎসর চব্বিশ বৎসর বা পঁচিশ বৎসর অন্তর হইয়া থাকে। যে দেখিয়াছে, যে এ সভায় বসিয়াছে সে উহার অনৈসর্গিক অতিপ্রাকৃত ঘটনা-সকলের সহিত পরিচিত। সে বার্ত্তা বলিতে নাই প্রকাশ করিতেও নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যবস্থা।

অঘোরীবাবা। দেখ ঠাকুর! অত কসাকসী এই কলিযুগে চল্‌বে না। সে টংক মজবুত দেহ কি আর কারুর আছে? হাজার বছরের গোলামী ও বদমায়িসীতে মানুষের দেহে কি আর কিছু থাকে? গোড়া কেটে দিয়েছিল বজ্রযানী বৌদ্ধরা, সে লোচ্চামীর ও মাতলামীর দোষেই পাঠানরা অত অল্প আয়াসে এ দেশে ঢুকতে পেরেছিল, তার পর মোছলমানী বিলাস। মানুষগুল সব হাজার পোড়ের লোহা হয়ে পড়েছে একটু টিপলেই গুঁড়ো হয়ে যায়। বোধ হয় এইটুকু বুঝেই নিতাই চৈতন্য নামের মহিমা প্রচার করেছিলেন।

গুরুজী। নামটাও কি ছাই কেউ বোঝে? নাম ও রূপ দুটোর মধ্যে একটা ধরতে পারলেই যে কাজ শেষ হয়ে যায়। কেবল হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বল্লে কি হবে? তা হ'লে ভারতবর্ষের সকল হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীর টিয়া পাখীগুলো আগে স্বর্গে যাবে। জপের চূড়ান্ত ঠাট্টাত তিব্বতে হয়েছে। জপের চাকা পর্য্যন্ত তৈয়ার হয়েছে। আমার ত সেই ক্ষোভ, নামটা পর্য্যন্ত নিতে পার্ল্লে না। নাম দেবার জন্যই, বিজয়কে ও হাবসীকে আমি গড়ে তোলবার চেষ্টা কচ্ছি।

অঘোরী বাবা। গড়নে দোষ ঘটছে। পেতল যে তেমন ভাল নয় পিট সইছে না। সুকুমারীর সয়েছে সে যে ছেলের মা, কিন্তু গড়ে ওঠে নি। অপরাজিতা আজও মা হতে পাল্লে না তাই তেমন গড়েও

উঠছে না। আর পুরুষগুলো—সে ত বিলিতি বিস্কুট। চাপলেই গুঁড়ো হয়ে যায়।

গুরুজী। আমার সেই ভাবনাই হয়েছে, ভাল ধাতু পেলুম না! অঘোরনাথ, বাঙ্গালা ছেঁচে একটা মানুষের মত মানুষ বার কর্ত্তে পারলুম না, অথচ বোধ শোধ যদি কারুর থাকে ত এখন বাঙ্গালীরই আছে। বুঝিয়ে দিলে বোঝে, কিন্তু বুঝ অনুসারে কাজ করিতে পারে না।

অঘোরীবাবা। তা পার্ব্বে কেমন করে। এই নন্দ তৈয়ার হয়ে উঠলে কতকটা হবে। কারণ গোড়া থেকেই আমাদের হাতে পড়েছে। তা পিতৃদোষ যে ফুটবে না তাই বা কে বল্লে? ইংরাজী-নবীশ বিজয় কি এ চাপ সইতে পারে? এতদিন সে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জিত আছে আর তার চোকের সম্মুখে দরিয়ার মত রূপসীকে নিয়ে তুমি আলেয়ার খেলা খেলছ। মহাপুরুষ ত ইসারায় সে সব কথা বলে দিয়েছেন, এখন একটু আজ্ঞা দাও। নইলে বিজয় পাগল হবে।

গুরুজী। নাঃ, আমি হারই মেনেছি। তোমরা "গুরু ভজার" দল, বৌদ্ধমতের বেদীর উপর তোমরা দাঁড়িয়ে কাজ কচ্ছ। তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমাদের পালা শেষ হল, দেখছি বেদের মত চলতে এখনও অনেক দেরী। "দেব ভজার" পুরুষকার আমরা হারিয়েছি। কর্ত্তার হুকুম হয়েছে এখন তোমরা দলে দলে নানা আকারে "সিদ্ধাই"এর ঝুলি কাঁধে করে' ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ঘুরে বেড়াও, যাকে পাও তারই কাণে ফুঁ দাও আর শিষ্য শাখা সংগ্রহ কর। আমি কর্ত্তার পাছু পাছু দেবপ্রয়াগ যাচ্ছি আর ফিরবো না। সে খবরও তোমরা পাবে।

অঘোরীবাবা। তা কথাটা নিতান্ত মন্দ বলনি। ঘুরিয়ে আনতে ত

হবে, তা যে উপায়েই হউক না কেন। বাঁধা বাঁধি নিয়মের অধীন কাউকে রাখব না, যে শিষ্য হতে চাবে তারই কানে মন্ত্র দেব আর পন্থার অভাব ত নাই, হাজার ধর্ম্ম পন্থা ভারতবর্ষে রয়েছে। যেটা যখন সুবিধে পাব তখন সেইটের সাহায্যে ধর্ম্মশূন্য ভারতবাসীকে ঘুরিয়ে আনবার চেষ্টা করব। কর্ত্তা যেন নানক পন্থার দিকে একটু ঝোক দিয়েছেন, তা কর্ম্মশূন্য বাঙ্গলায় চালাতে পাল্লে ও মতটা চলবে ভাল। বেদান্তের বহিরাবরণের ভিতর দিয়ে ভক্তি তত্ত্বের বাহ্যিক জলুষ ছুটিয়ে কাজ কর্ত্তে হবে। পাওহারী বাবা, তোতাপুরী, এবং দয়ালদাস কতকটা জমী করে এসেছেন এইবার মই দেওয়া বীজ ছড়ান বাঁকী; তার মানুষও ঠিক হয়েছে। কবে যাবে?

গুরুজী। দক্ষিণ হয়ে উত্তরে যাব। নর্ম্মদা গোদাবরী কাবেরী স্নান করে রামেশ্বরে রত্নাকরের জলস্পর্শ করে মহারাষ্ট্রের পথে উত্তর দিকে যাব। আগামী আষাঢ়ের পূর্ব্বে দেব-প্রয়াগে পৌঁছিব। বৈষ্ণবী চাল চালিতে হয়, তান্ত্রিক চাল চালিতে হয়—যে চালই চালিতে হউক না কেন তোমরা তাহা করিবে। আর ছত্রিশ বৎসর পরে হয় বাঙ্গলায় নয় কামরূপে নূতনরূপে আমায় দেখিতে পাইবে।

অঘোরী। আমিও সেই সময় মহাকালের মন্দির থেকে নেমে পারি ত আপনাকে চিনে বাঙ্গলায় আবার একটু ফুটব, এখন অন্য লোকে কাজ করুক। বিজয়ের ব্যবস্থা আমিই কর্ব্ব এখন। দুই বেটা বেটীকেই একটু ধাক্কা দিতে হবে। বিজয় বড় হিসাবী বড় স্থির বলে তার বিশ্বাস, আর হুকুমের বাঁদী মনে করি দরিয়া মাধবীলতার মত রূপের সোহাগে কেবল টলমল কচ্ছে, তাকেও একটু শিক্ষা দিতে হবে।

গুরুজী। তা যা করবার তা করো। আমার ত মনে হয় হাবসী ত

হাতছাড়া হয়েছে। সে একটা নূতন গড়ন পেয়েছে। তা হলে হাবসী ও সুকুমারী এই দুই নারীকে নিয়ে তুমি একটু ভাবের খেলা খেলতে পার।

এমন সময় ঝর্ণার তটভূমি হইতে গান উঠিল—

তারে বেঁধনা সখিরে সে যে আমারই বঁধু

এই গান শুনিয়া উভয়ে চমকাইয়া উঠিলেন। এত দরদভরা মাধুর্য্য ঢালা গান এই দুই অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও হয়ত শোনেন নাই। উভয়েই চমকাইয়া উঠিলেন, গুরুজী একটু মুচকী হাঁসিয়া বলিলেন,—"সহচরী বামাসুন্দরীর মত এবেটী যদি গানগেয়েও বেড়াত তা হলেও কতকটা কাজ হত। হ্যাঁ হে অঘোর, এখন নাকি বাঙ্গলায় বদন ও গোবিন্দের কৃষ্ণযাত্রা এবং মনোহর সাহী কীর্ত্তন তেমন করে আর শোনে না!"

অঘোরী বাবা। শুনবে কি সে রকম গাইয়ে যে নাই। সে কলেজা নেই। কতক ম্যালেরিয়ায় নষ্ট হয়েছে, কতক বিলিতী রুচিতে নষ্ট হয়েছে। এখন বাঙ্গলার ইংরাজী-নবীশ বাবুর দল বিষম মেয়ে-ক্যাওলা হয়ে পড়েছে। বঙ্কিমই ইহার পত্তন করে গিয়েছেন। তাতে কি সাহিত্যে, কি নাচ গানে থিয়েটারে সর্ব্বত্রই কেবল কামের ইন্ধন যোগান হইতেছে ভাষার আবরণে রীরংসার বিশ্লেষণ চলিতেছে, সেই বাঙ্গলার বাঙ্গালী ইংরেজী-নবিশ বিজয়কে তুমি এতদিন মেয়ে মানুষ ছাড়া করে রেখেছ, বেচারী ঠিক থাকে কেমন করে? আর হাওয়া যে মন্দ!

গুরুজী। হ্যা হে বিন্দু এখনও আছে?

অঘোরীবাবা। বোধ হয় আছে—বোধ হয় কেন আছে। তার মতন নারী আর কটা পাবে! রূপকে সমান ভাবে বজায় রেখে সে প্রায় শত বৎসরকাল নামের মহিমা কীর্ত্তন করেছে কিন্তু ফল হ'ল কি? তাকে খুঁজে বার

করাই কঠিন। সে রূপনারায়ণ ও দামুদরের মধ্যের ভূমি ছেড়ে আর কোথাও যায় না। থাকীবাবা ও বামা খ্যাপা তার একটু আধটু চাল নিয়ে চলেছিল কিন্তু স্বয়ং চণ্ডী সে তাকে ধরাই মুস্কীল। বোধ হয় এইবার খোলস ছাড়বে। নাঃ কথাটা ঠিক ; সত্যই আমাদের একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। সেন্নুমী কি বলে ?

গুরুজী। সেও হাবিদের দলে মিশেছে। সে বলে শাস্ত্র মিথ্যা হবার নয় কল্কী অবতারের যে কল্পনা সেই কল্পনার অনুসারে ইয়ুরোপ ও এসিয়ার অবস্থা গুটিয়ে আসছে। একটা বড় মারামারি কাটাকাটি ইউরোপে শীঘ্রই আরম্ভ হবে ; সে আগুন পরে এসিয়া ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িবে। ভাল আদর্শচ্যুত যথন মানুষ হয়েছে তথন কেটে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাঁটা ঘাস বড় জন্মেছে, বাগান পরিষ্কার কর্ত্তে হবে। এখনকার ধর্ম্ম কেবল মার কাটের ধর্ম্ম, এইবার শিবের ভাবাবতার সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিবে।

অঘোরী বাবা। তবে আর কেন। এই বেলা নে ঘর ছেয়ে। তুমি সার বুঝেছ এই বেলা খোলস বদলে আসাই ঠিক। আমিত ঐ পথ ধরব। তবে নাম আর রূপ বেশী বদলাব না। মণিপুরে গিয়ে এই কাজটা কর্ত্তে হবে।

গুরুজী। তবে ঐ কথাই রইল। দেখ আসল মন্ত্রটি ভুল না, আমাদের জন্মজন্মান্তরের উহাই পরিচারক।

অঘোরী বাবা। গুরু আছেন কিসের জন্য, তাঁর কাজ তিনি করবেন আমার কাজ আমি কর্ব্ব।

আবার গান উঠিল। লাজে যে মরি গো,—আমারই বঁধুয়া আন ঘরে যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া। গানে গানে পবন যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় খণ্ড।

উপাসনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্দর্শন।

বিজয় সত্যই পাগল হইয়াছিল, দরিয়ার প্রেমে বা রূপে হাবুডুবু খাইতেছিল, কিন্তু সে ভক্ত শিষ্য, এতদিন মনের কথা প্রকাশ করে নাই। গুরু যেমন আজ্ঞা করিয়াছেন তেমনি কাজই করিয়াছে, তবে রূপের উন্মাদে সে কাজগুলি ভালই করিয়াছে। গুরুর আজ্ঞায় বিজয়, হোসেন খাঁ সাজিয়া দরিয়া ও সুকুমারীকে চৌকি দিতেছিল, চৌকি দিবার সময়, প্রহরার সময় তাহার কপাল পুড়িয়া ছিল, পাছে কথা কহিলে ধরা পড়ে এই শঙ্কায় সে কথা কহিত না কেবলই দেখিত, এই দেখাই তাহার পক্ষে কাল হইয়াছিল।

গৃহস্থের ছেলে বিজয় ইংরেজি লেখা পড়া শিখিয়া সংসারের কর্ত্তা হইয়াছিল। সে খাইত পরিত বেড়াইত, সংযম সন্ন্যাসের কখনও ধার ধারে নাই, কেবল অভাবে ও দুঃখে বাধ্য হইয়া যা একটু সংযম করিতে হইত তাহা ছাড়া সংযমের হিসাবের সংযম ব্রত কখন অবলম্বন করে নাই। তাহার উপর প্রথম যৌবনেই হাবসীর মতন দলমলে, আদুরে এবং অনুগতা সেবাদাসী পত্নী পাইয়া সে পরম সুখেই কাল যাপন করিতেছিল।

তাহার অভাব ছিল না অসন্তোষ ছিল না, তাই পরের জন্য খাটিতেও পারিত; ভগিনী ও ভগ্নীপতির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। ইহাকেই বিজয় সংযম সন্ন্যাস মনে করিত, তাহার পর গুরুর আজ্ঞায় সে পত্নী হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে থাকিতে বাধ্য হইল। রোজগার পাতি করা, বিষয় কর্ম্ম করা বন্ধ হইল, আর সেই অবস্থায় সামান্য একটু জপতপ করিয়া একটু দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিবার পরই তাহার উপর হুকুম হইল তুমি দরিয়ার পাহারায় থাক সেই পাহারা দিতে দিতে তাহার মন মজিল, তাহার পর সেই মজা মন লইয়া সে দরিয়াকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কোমর বাঁধিল। রূপোন্মাদ ক্রমে প্রেমের আকার ধারণ করিল।

যে দরিয়ার চিত্র তাহার হৃদয়ে গাঁথা ছিল, এইবার সেই দরিয়া আবার তাহার চোখের উপর খদ্যোতের মত ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এলাহাবাদের চড়ায়, ঝুসীর চড়ায়, সেই একান্ত নির্ব্বান্ধব দেশে সে দরিয়াকে দেখিতে লাগিল। তাহার উপর দরিয়া যতদিন অন্ধনগ্না-বস্থায় পাগলিনী সাজিয়া অপরূপ রূপের লহর তুলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত ততদিন, বিজয় তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সেই সময়েই প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদিন বিজয়ের সামর্থে কুলাইয়া ছিল ততদিন সে চাপিয়া রাখিয়া ছিল। যখন আর পারিল না, শত বৃশ্চিক দংশন জ্বালার মত সে জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিল তখনই সে ফুটিয়াছিল, কিন্তু ফুটিয়াই নিরাশ হইল। তাহার মত ধীর বুদ্ধি পুরুষের বুঝিতে বাঁকি রহিল না যে দরিয়া তাহাকে চায় না সুকুমারকে চায়। বিধাতার এমনিই বিড়ম্বনা যে সুকুমার দরিয়াকে ভাল বাসিলেও, তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেও, কখনই সে দরিয়ার উপর উৎপাত উপদ্রব

করিতে সাহসী হয় নাই। যখনই তাহার মনে সেরূপ অভিলাষ জাগিত, তখনই নন্দর মুখখানি তাহার হৃদয়াকাশে চাঁদের মত ফুটিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীও দেখা দিত। তাহা ছাড়া দরিয়াও তেমন ধরা দেয় নাই, তাই সুকুমার প্রেমের খেলায় রক্ষা পাইয়া ছিল। বিজয়ের হৃদয়ে বাৎসল্যের প্রবাহ ছোটে নাই, বিধাতার বিধানে সে পুত্র বা কন্যার মুখ দেখিতে পায় নাই তাই তাহার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা পদ্মার তরঙ্গ প্রবাহের মত অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে চাহিত। ধর্ম্মের ও সংযমের বালির বাঁধ যতটুকু সম্ভব এ স্রোত মুখে আটকাইবার চেষ্টা করিত বটে কিন্তু তাহা টিকিত না।

মাঘমেলা ভাঙ্গিয়াছে। ঝুশীর আশ্রমের সকল অতিথী অভ্যাগত সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতেছেন, সে নির্জ্জন প্রান্তর ক্রমে ক্রমে নির্জ্জনতার ভাব অবলম্বন করিতেছে, একদিন সকালে গুরুজী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ সুকুমার ও সুকুমারী নন্দকে লইয়া স্বামীজীর সঙ্গে কাশী যাইবে, আমি সন্ধ্যার ট্রেনে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইব, বিজয় তুমি দরিয়াকে সঙ্গে লইয়া দেব প্রয়াগে হাবসীর কাছে রাখিয়া আসিবে এবং সেইখানেই আমার পত্রের অপেক্ষা করিবে। এখানকার বন্দোবস্ত আমি অন্যরূপ করিয়া গেলাম, সে পক্ষে তোমাদের কাহারও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।"

এই কথা কয়টি শুনিয়া বিজয় শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল এ আবার আমার প্রতি কেমন হুকুম। ঠাকুর ত সবই জানেন তবে এ ভার আমার উপর ন্যস্ত করিলেন কেন? বিজয় নীরব রহিল দেখিয়া গুরুজী আবার বলিলেন, "হাঁ হাঁ তোমাকেই লইয়া যাইতে হইবে।" পর্য্যাপ্ত টাকা পয়সা

দিতেছি, গরম কাপড় চোপড় কিনিয়া সত্য গৃহীর সাজে সজ্জিত হইয়া যাও। তোমার ভগিনী ভাগিনেয়ের ভার আমাদেরই সে পক্ষে আমরাই ব্যবস্থা করিয়াছি। অঘোরী বাবা তোমার সহিত হরিদ্বারে সাক্ষাত করিবেন এবং হয়ত তোমাদের সঙ্গী হইয়া দেব প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইবেন। বিজয় এবারও কোন কথা কহিল না দেখিয়া সুকুমার একটু মুচকি হাসি হাঁসিলেন। তখন যেন একটু ঝোঁকের উপর বিজয় বলিলেন, যে আজ্ঞা।

সেই সময় দরিয়া সেখানে আসিল এবং হাসিয়া বলিল, আমাকে আবার সেই পাহাড়ের দেশে যেতে হবে। সুখের মধ্যে এই যে হাবসীকে সঙ্গিনী পাব, তবে ভাবনা এই পথে ইহাঁর সঙ্গে যাইতে হইবে, এমন হুকুম কেন করিলে প্রভু ?

গুরুজী। এইবার তোমার শেষ পরীক্ষা। এইটেই উত্তীর্ণ হইলেই মা তুমি স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিবে। আমার সহিত তোমার আর দেখা হইবে কিনা বলিতে পারি না, আমার বয়স হইয়াছে শরীর জীর্ণ হইয়া আসিতেছে, নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে হয়ত এবার আমাকে কোনও খানে দেহ রাখিতে হইবে। তুমি আমার বড় সাধের মেয়ে আশীর্ব্বাদ করি তুমি ভাবময়ী ও কর্ম্মময়ী হও। এই কথা শুনিয়া দরিয়া সাষ্টাঙ্গে গুরুজীকে প্রণাম করিল, তাঁহার পদধূলী গ্রহণ করিল পরে সোহাগভরে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল। গুরুজী দক্ষিণ হস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন,—পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার মা হইয়া দাঁড়াও তাহা হইলেই আমার সাধ মিটিবে।

দরিয়া। এত ঠাকুর আপনার ছেঁদো কথা নয়, তবে কি সত্যই আপনি

আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, আমি যে একেবারে অনাথিনী হব। চির দিনটাই এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াব? কোনও কূল কিনারা পাব না।

গুরুজী। একটা শ্যামা বিষয় গান শুনেছ? শুন নাই তবে শুন।

জান না রে মন পরম কারণ
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরি বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥

কেন তুমি পুরুষ হবে। মুক্তমালা ছেড়ে বনমালা পরবে, অসি ছেড়ে বাঁশী ধরবে, তোমার কিনারা তুমি করিয়া লইবে, আমরা কে কি করিতে পারি মা? সন্ন্যাস লইয়া সামান্য একটু ভজন সাধন করিয়া ভাবিয়া ছিলাম মনুষ্যতত্ত্ব বুঝি বুঝিয়াছি, কিছুই বুঝি নাই, এ জীবনটা কেবল কাদা ছানি-তেই কাটিয়া গেল তাই দেখি ভেক্ বদলে আমি নূতন করিয়া পত্তন করি, এবার পারি কি হারি জানি না, চেষ্টা করিতে আপত্তি কি?

গুরুজীর মুখের কথা শুনিয়া দরিয়ার দুই চোখ দিয়া জল আসিল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। গুরুজীর যেন একটু আঘাত লাগিল তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "যাও মা সব যোগাড় যন্ত্র করে দাও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে রওনা হতে হবে, শুধু আমিই নয়, আরও অনেকে যাবেন ত, তাহাদের ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, তোমারা দুই চারি দিন এখানে থাকিয়া পরে যাত্রা করিও।

সেই দিন একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন, বিজয়, দরিয়া এবং জন কয়েক শিষ্য আশ্রমে রহিলেন। বিজয় দরিয়াকে কোনও কথাই বলিল

না তবে তাহাকে চোখের আড়ালও করিল না। সে কেবল দেখে, চোখে চোখে দরিয়াকে রাখে আর ম্লান মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেলামেশা।

বিজয় কথা কহে না কেবল দেখে আর দরিয়া কেবল গান গায়। নয়ন দুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, দেহখানিকে হেলাইয়া দুলাইয়া কেবল গান করে। বিজয় সে গান শুনে এবং তাহাকে দেখে। যেদিন তাহারা প্রয়াগ ছাড়িয়া যাইবে সেই দিন সকালে স্নানান্তে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দরিয়া এই গানটি গাইল, শুধু গানই নয় বিলোলবক্র ইঙ্গিত করিয়া, নানা ছলা কলা প্রকাশ করিয়া গাহিল—

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিল
ঝালেতে ঝালিল রে।
স্বাদু নাহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে ?
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পীরিতি রস এই মতি
কি জানি কেমন হল॥

দরিয়া

পীরিতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাড়াইনু তাথে।
তবে সে সজনী দিবস রজনী
আনন উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পীরিতে ডুবিল দেহ।
নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥

বিজয় গানটি শুনিয়া শিহরিল, যেন গৃহের প্রাচীর গাত্রে মিশাইয়া গেল, তখন যেন দরিয়া আরও একটু মাত্রা চড়াইয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া এই গানটী ধরিল।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হউ বর নারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতি মাল শিরে নহ সঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণীরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ না কপাল॥

বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহে মলয়জ পঙ্ক॥

এই গানটি শেষ করিয়াই বলিলেন—এই বার রাম বসুর গান শোন, আসল শুনিলে নকল শোন,—

আমি নারী হর নই শুন হে মদন।
বিনা অপরাধে কেন বধহে জীবন॥
এ যে বেণী ফণী নয়—নহে জটাজুট।
কণ্ঠে নীলকান্ত আভা নহে কালকুট॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু চন্দন দেখিয়ে।
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন শশী হুতাশন॥

ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ শ্লেষ মিলাইয়া, হংসীর ন্যায়, কণ্ঠ দুলাইয়া নয়ন ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া মুক্ষী পায়রার মতন বুক তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দরিয়া এই গান তিনটি সুন্দর সুর লয়ে আবৃত্তি করিল। এই গানের সময় কড়া ভরা দুধ উনানের উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে দিতে যেমন সহসা উতলাইয়া পড়ে দরিয়ার রূপও তেমনি উতলাইয়া উপচাইয়া উছলিয়া পড়িল। এতক্ষণ বিজয় চুপ করিয়া ছিল এইবার দরিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বদ্ধাঞ্জলী হইয়া বলিল, দরিয়া রক্ষা কর, এমন করিয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না।

দরিয়া। বিড়াল যত ইন্দুর ধরে সবগুলাই কি খায় না সদ্য সদ্য মারিয়া ফেলে? শিকারী যত হরিণ মারে সবই কি খায়? জানি আমি দিবালা দরিয়া—উন্মাদিনী, আমার যা খুসী আমি তাই করিব।

দরিয়ার এই উত্তর শুনিয়া বিজয় ভাঙ্গা তালাটির মত ক্রমে ক্রমে নুইয়া বাঁকিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল এবং উদাস নয়নে দরিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিল, দেখ দরিয়া আমি অপরাধী, ঘোর পাপী কিন্তু আমি আমার নিকট অপরাধী, আমার পত্নীর নিকট অপরাধী তোমার কাছে নই, তোমার কোনও ক্ষতি করি নাই, বরং আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু কুলাইয়াছে তত টুকু তোমার উপকারই করিয়াছি কখনও সে উপকারের জন্য প্রত্যুপকার চাহি নাই, আমাকে এ তুষানলের জ্বালা দিতেছ কেন ?

দরিয়া। ইস ! আবার অভিমানটুকুও আছে। তুমি আমার কি উপকার করিয়াছ। গুরুর শিষ্য তুমি, গুরুর আদেশ পালন করিয়াছ মাত্র, আমি ত বিপদে পড়ি নাই। আমি জানিতাম গুরু আমাকে পক্ষ পৃষ্ঠে রক্ষা করিতেছেন, সে কথা মিথ্যাও নহে। স্বরূপদাসের আকড়ায় যাওয়া সে আবার কিসের বিপদ ? সেত গুরুর লীলা। তুমি এমনিই বোকা এখনি মর্কট হইয়াছ, যে সে কথা তুলিতে লজ্জা বোধ করিলে না। দেখ বিজয় আমি নারী, কিন্তু আমি অনেক পোড় খাইয়া ইস্পাতের মত মজবুত হইয়াছি। পুরুষ মর্কটগুল যে কেমন তা গুরু আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন। নগ্না ভিখারিণী বেশে আমি সে অভিজ্ঞতা হাসিল করিয়াছি। সাবধান আমার প্রতি আর অমন দৃষ্টি দিও না।

বিজয়। ক্ষমা কর দরিয়া। আমি শত অপরাধে অপরাধি। আমার ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছে, গৃহদাহে যেমন অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড সকল ফুটিয়া ফাটিয়া আসিয়া বাহিরে পড়ে, আমারও তেমনি হৃদগত পাপপুণ্য-সকল দগ্ধ অঙ্গারের মত ছিটকাইয়া আসিয়া বাহিরে পড়িতেছে। অল্প বিস্তর মর্কট আমরা সবাই, তবে আমি সে মর্কটকে মোটা শিকলেই বাঁধিয়া

রাখিয়াছি সে ভয় তোমার নাই। আমার অনুরোধ এই তুমি আমায় আর জ্বালাইও না।

দরিয়া বিজয়ের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, আমার অনুরোধ এই যে তুমি আর আমার প্রতি অমন দৃষ্টিপাত করিও না। মোটা শেকল থাকলে মর্কট অত লাফায়, না যার তার প্রতি দাঁত খিঁচিয়ে আসে। মিনসে এখনও আসল তত্ত্বটা বুঝলে না আমার দুঃখই ত ঐ। কি জানি গুরুজী এ পিতলের কাটারী লইয়া কি কাজ করিবেন।

বিজয় এ তিরস্কারের বাণী শুনিয়া হেটমুণ্ড হইল এবং নীরবে রোদন করিতে লাগিল। তখন দরিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া বিজয়ের হাত ধরিয়া বলিল, উঠ, উঠ, আমার ভ্যারেণ্ডার যষ্টি, আমার একমাত্র অবলম্বন, আমার দুস্তর ভবসাগরের ভেলা—উঠ, উঠ, আর কাঁদিও না, মেয়ে মানুষকে জব্দ করিবার অন্য অস্ত্র নাই, পুরুষের চোখের এক এক ফোটা জল এক একটা বোমার মত আমাদের হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করে উঠ, আমি তোমার কাছে শত অপরাধে অপরাধি। উন্মাদিনী বিদেশিনী আমি কখন কি বলি, সে সব কথা মনে রাখিও না, উঠ বিজয় আমার গুরুদত্ত সম্পত্তি তুমি, গুরুভাই, এক আশ্রমের আশ্রমি উঠ উঠ আমায় ক্ষমা কর।"

উদাস, অশ্রুপ্লাবিত নয়ন দুইটি তুলিয়া বিজয় একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"দরিয়া আমি তোমার গুরুভাই নই। আমার গুরু আমার ইষ্ট, অঘোরী বাবা। আমি শাক্ত, তুমি বৈষ্ণবী। আমার ইষ্ট দেবতার হুকুমেই আমি তোমার গুরুর আশ্রয়ে ছিলাম। জানি না তিনি আমাকে লইয়া কি খেলা খেলিতেছেন কিন্তু মনে থাকে যেন আমি তোমার গুরুভাই

নহি। তুমি নারী, শক্তি, ইহা ছাড়া আর কিছু আমি তোমাকে জানি না, অন্য ভাব ইহার মধ্যে আনিও না।

হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! তোরা দুটো ছেলে মেয়েও বেশ ধুলখেলা কচ্ছিস্। দেখিস ধুলোর মন্দিরের চুড়া যেন ভেঙ্গে না পড়ে। হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! কি মজার দুনিয়ারে—কি আজব মানুষ, মানুষের মন! এই বলিয়া অঘোরী বাবা হাসিতে হাসিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয় শ্রীগুরুর দর্শন পাইয়া সেই অর্দ্ধশায়িত অবস্থা ত্যাগ করিয়া দণ্ডবৎ তাঁহার পদতলে লুটাইতে লাগিল এবং তাঁহার চরণের খড়মের উপর মাথা টুকিয়া বলিতে লাগিল, রক্ষা কর ঠাকুর, এ অপমান এ লাঞ্ছনা আমার সহ্য হয় না। আমি জীবনে কখনও এমন অপমান সহি নাই। আমি জীবনে কখনও এমন ভাবে ধরাও দিই নাই। দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের সম্বল, অন্তর্য্যামী পুরুষ তুমি, তুমিত সব জান তবে কেন এমন ভাবে আমাকে নিগৃহিত করিতেছ, আমি যে কাটা পাঁঠার মত ছটপট করিতেছি আমার এ দুর্দ্দশা তোমার শ্লাঘার পরিচায়ক নহে। আমায় রক্ষা কর।

বিজয়ের আর্ত্তনাদ শুনিয়া অঘোরী বাবা স্তম্ভিত হইলেন, সে হাসি মুখ কোথায় মিলাইয়া গেল তাহার পরিবর্ত্তে সে মুখের উপর বিন্ধ্যাচলের স্থৈর্য্য ও গাম্ভির্য্য আসিয়া প্রকট হইল, অজেওতার ঘন ঘটায় যেন তাহা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর চক্ষু দুইটি হইতে যেন একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দরিয়া সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল। ধীরে ধীরে সেও নতজানু হইয়া উর্দ্ধমুখে করযোড়ে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিল। বাবাজী কোনও কথাটি না কহিয়া দক্ষিণ চরণ খড়ম হইতে

তুলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বিজয়ের ব্রহ্মরন্ধ্রের স্থানে স্পর্শ করিয়া ছিলেন আর বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দরিয়ার মস্তকের কেশ গুচ্ছের ভিতর যেন আদরের অঙ্গুলী চালন করিতে লাগিলেন। দুইজনের দেহই যেন কি এক বৈদ্যুতিক শক্তিতে কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয় উঠিয়া বসিল এবং বদ্ধজানু হইয়া আবার গুরুদেবকে প্রণাম করিল। দরিয়াও তদনুরূপ করিল। বাবাজী এইবার হাসিলেন, তেমনি উচ্চ হাস্য করিয়া আবার বলিলেন। হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! বুঝেচিস বেটি এ দুনিয়াটাই নর ও নারীর খেলা, পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা ইহা ছাড়া আর কিছু নাই। এক আমি..বহু হইব এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্যই এই সৃষ্টি প্রহেলিকা রচিত হইয়াছে। পর্ব্বত ও সমুদ্র যেমন প্রহেলিকা ইহাও তেমনিই, পর্ব্বত গাত্রে গিরি তটিনী যেমন উহার হৃদয়ের শ্রাদ্ধতার পরিচারক। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেমন অগাধ তোয়নিধির অপরিমেয় তাগের এতটুকু পরিচারক, প্রেম তেমনি—নর নারীর সম্মিলন আকাঙ্ক্ষা তেমনি অজেয় সৃষ্টি প্রহেলিকার পরিচারক। বিধাতার বিধানে তোমরা দুইটি এক ঠাঁই হইয়াছ, তোমার গুরুর আশীর্ব্বাদ সে আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে। রমণী তুমি তোমাকে জননী হইতেই হইবে। আর ছলা কলা করিও না, এক বৃন্তে দুই ফুলের মত সাজিয়া গুছিয়া রূপের সাজি পূর্ণ করিয়া হরিদ্বারে যাও আমি সেখানে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রে সঙ্গমে।

নদী যাইয়া সমুদ্রে পড়ে, দরিয়ার পর্য্যবসান সাগরেই। দরিয়া ও বিজয় খাঁটি বাবু বিবি সাজিয়া হাসি মুখে হরিদ্বার যাত্রা করিল। সে এক ঢংই আলাদিয়া, যেন সে দরিয়াই নাই, সে বিজয়ও নাই, তোফা বিলাসী বাবু বিবি, উভয়ে যাইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইল এবং গঙ্গার কাছেই প্রায় তটের উপরেই একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিল। দরিয়ার দুই গুরু ভাই বেমালুম খানসামা বাবুর্চ্চি সাজিয়া ইহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারাই বাবু বিবির সেবার কার্য্য যথা রীতি করিতে লাগিল। দরিয়া গোসলখানায় যাইয়া স্নানাদি করিয়া বাহিরে আসিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া বিজয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"কি বল বিজয় এ দুনিয়াটা গোল নয় কি? আবার সেই সুখ বিলাস, সেই বোম্বাইএর কাশ্মীরের বাবুয়ানীর উপভোগ, কে জানে হাপসী কি কচ্ছে? তার জীবনটা কতকটা একঘেয়ে হয়ে পড়েছে না?

বিজয়। হাপসী যে রকম ঘোরা ফেরা করেছে আর যে রকম স্থানে আছে তাতে ত বল্‌তে ইচ্ছে করে, যে তার জীবনটা বেজায় একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। খাবার ভাবনা আমাদের নাই। বাবাজী যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন এখন আমরা এই খেলাই খেলি। সকাল বেলা চা-পান হয়েছে?

হাসিয়া দরিয়া বলিল,—"চা বিস্কুট সব তৈয়ার। ছক্কু ছোট হাজরীর সকল ব্যবস্থাই করে রেখেছে, এখন খাবে এস।

বিজয়। খাব ত খাচ্ছিও ত কিন্তু আসল ব্যাপার কোথায় ?

দরিয়া। তারও বন্দোবস্ত বেশ আছে।

বিজয়। আছে নাকি ? হোঃ! হোঃ !! হেরে গেল আমার কথাটা বুঝতে পারলে না !

দরিয়া। না গো পণ্ডিত মশায় আমি সব বুঝেছি। কেবল বাবাজীর অপেক্ষা কচ্ছি। একটা গান শুনবে ?

এই বলিয়া দরিয়া জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু এই গানটা বেশ ভাবের সহিত গাহিল।

বিজয় মুচকি হাসিয়া বলিল, দরিয়া কোনটা ভাল ? মিলন না বিচ্ছেদ।

দরিয়া। শাস্ত্র মানিয়া কথা কহিতে হইলে বলিব বিচ্ছেদই ভাল। মাথুরই মধুময়, আর রক্তমাংসের শরীর লইয়া বলিতে হইলে বলিব মিলনটা মন্দ নয়। একটা নূতন কিছু পাওয়া যায়।

বিজয়। যদি না পাওয়া যায়।

দরিয়া। তবে বেজায় বাজে। আসে না কোনও কাজে। কেবল মর্ত্তে হয় লাজে।

বিজয়। বটে। কিন্তু তোমার বৈষ্ণব শাস্ত্র বলে গুপ্ত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মিলন চলিতেছে।

দরিয়া। সে যে গুপ্ত গো। এ যে বেজায় ব্যক্ত হরিদ্বারে দোতলা বাড়ী সেই খানে মিলন। এতে আর তাতে ?

বিজয়। এই থেকেইত তাই। অন্য কিছু ত নাই। এই ধারেই ত সেই পাই।

দরিয়া। দূর খ্যাপা! এ না পেলে সেটা মেলে। এটুকু জান

না? বৈষ্ণবরা এই গুপ্ত তত্ত্বই বাহির করিয়াছে যাহা না পাইলে মেলে যাহা না চাহিলে আসে এবং যাহা না চাইলে ফুটিয়া উঠে তাহাইত তাই।

বিজয়। অত কথা জানিনে ভাই। রাই কুড়াইয়া বেল চাই মেলে ভাল, না মেলে বহুত আচ্ছা। বলি স্নানটা কবে করবে। কাল যে দোল পূর্ণিমা।

দরিয়া। বাবাজী আসুন তবে ত ঠাকুর পাঠে উঠবেন। তবে ত দোল পূর্ণিমা হইবে।

"দোলে রে যৌবন ধন মতচোল রাঙ্গাওয়ে।
চুনিব চুনি কলিয়া মলিয়া বনাবায়ে॥"

কি বল শ্যামদাসের হোলির পদ্যগুলি গাহিব নাকি?

বিজয়। রক্ষা কর! এখন নয়। এ সময় ও গান শোনা যায় না। ঠাকুর আসুন তখন বুঝা যাইবে।

এমন সময় বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চল আজই তোমাদের স্নান করাইব এই বলিয়া তিনি একখানি কেদারার উপর বসিলেন।

দরিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা টেপায়ার উপর রাখিয়া বলিল, সে কি ঠাকুর, আমরা যে বাবুয়াণীর কেতামত সকাল বেলা চা পান করে বসে আছি। এমন অবস্থায় কি সঙ্কল্প করিয়া স্নান করা চলে।'

বাবাজী। দূর পাগলী। তাম্বুল, পাণীয়, ঔষধী প্রভৃতি সেবন করিলেও ধর্ম্ম কর্ম্ম করা চলে। আর যে পাল্লায় পড়েছ তাতে পান চিবুতে চিবুতেও এমন কি ভোজন করিতে করিতেও জপ করা চলে।

দরিয়া। তবে আমি সেজেগুজে আসি, যাও বিজয় তুমিও গেরস্থ বামুন সেজে এস।

ক্ষণেক পরে, উভয়ে বিলাতী সাজ পরিহার করিয়া স্নানের সাজে ও বস্ত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাদের দুইজনকে দেখিয়া বাবাজী একটু হাসিলেন এবং নিজের মনেই বলিলেন—

সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥

বাবাজীর মুখে গান শুনিয়া বিজয় ও দরিয়া উভয়ে তাকাতাকি করিয়া হাসিল। বাবাজীও হাসিলেন এবং মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা বেটী আজ ওবেলা গান শোনাব, পারিস ত নকল করিস।

দরিয়াও হাসিয়া বলিল, তা বেশ দেখা যাবে। বাপ বেটীতে গানের পাল্লা দেওয়া যাবে কিন্তু শুনবে কে?

বাবাজী। পারবি? সারাদিন উপোষ করে থাকতে হবে বার দুই তিন স্নান কর্ত্তে হবে, আজ তোদের দুজনকেই পূর্ণাভিষিক্ত করে ছেড়ে দিব।

দরিয়া ঠোঁট উলটাইয়া সোহাগ করিয়া বলিল—আমি কি না পারি, আমি কেমন লোকের কুমারী, আমি কি কারুর কাছে হারি, আমি যে নারী।

দরিয়ার আদরের কথা শুনিয়া বাবাজী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, বটে বটে মা। তুমি যে নারী। নারীই জগত জননী সুতরাং অপরাজিতা, তোমায় হারায় কে? হরও পারে না, আমি ত কোন ছার। এই বলিয়া বাবাজী উঠিলেন, তিনি অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, বিজয় ও দরিয়া তাঁহার পশ্চাতে চলিল। বাবাজী, সংযত পুরুষকারের আদর্শ, রূপবান পুরুষ দীর্ঘ দেহ সুগৌর বর্ণ, প্রসন্ন ললাট, বিস্তারিত বক্ষ

এবং সুদৃঢ় পেশীবদ্ধ বিশাল বাহুযুগল সন্ন্যাসীর কেন্দ্র হরিদ্বারে এমন শক্তিমান রূপবান পুরুষ কচিৎ কদাচিৎ কেহ দেখিতে পাইয়াছে, আর তাঁহার পশ্চাতে অপূর্ব্ব সুন্দরী গিরিবালা গৌরীর মত দরিয়া, পুষ্পিত পলাশের মত চলিয়াছে, তাহার পার্শ্বে যেন কনকচাঁপার স্তবক, পুরুষাকারে পরিণত হইয়া বিজয়রূপে যাইতেছে। এমন ত্রিমূর্ত্তি হরিদ্বারে কেহ দেখে নাই। ইহারা তিন জনেই এ'দিক ওদিক কোনও দিকে না তাকাইয়া একটা বাজে ছোট ঘাটে যাইয়া উঠিলেন, সেখানে ঘাটের উপর সামিয়ানা টাঙ্গান আছে এবং একটা বড় যজ্ঞের উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে, অনেকগুলি কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ হোমের আয়োজন করিতেছেন। এ সকল জোগাড়যন্ত্র দেখিয়া বিজয় দরিয়ার দিকে তাকাইল, দরিয়া বিজয়ের প্রতি তাকাইল এবং হাসিয়া বলিল, বিজয় আজ আমাদের যুগলে বলিদান, হাড়কাঠে গলাটা ভাল করিয়া আগাইয়া দিও। আমি সে পক্ষে কোনও সঙ্কোচ করব না। উভয়ে হাসিমুখে গঙ্গাতীরে অবতরণ করিল, সঙ্গে বাবাজী এবার আর একটি সুযোগ পাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

সেদিন হরিদ্বারে বড় ধুম, দরিয়ার ও বিজয়ের নূতন করিয়া অভিষেক হইল তজ্জন্য হোম মন্ত্রপাঠের ধুম ত ছিলই, ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী ভোজনের ধুম অধিকতর হইয়াছিল। এ রকমের দম্পতি অভিষেক পূর্ব্বে

কখনও হয় নাই বলিয়া সে কর্ম্ম পদ্ধতি দেখিবার জন্য হরিদ্বার এবং তাহার নিকটবর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে বড় বড় কর্ম্মী ও পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, হৃষিকেশ তপোবন হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসীও আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছিলেন। সর্ব্ব রকমের প্রায় দশ হাজার লোকের পান ভোজন বিদায় প্রভৃতি কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এত আয়োজন এমন সুশৃঙ্খলা যে হইবে তাহা দরিয়া কিম্বা বিজয় কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। বাবাজীর যে এত লোকবল এবং অর্থবল আছে তাহাও তাহারা জানে না। দুজনে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কাঠের পুতুলের মত মন্ত্র পড়িল, অভিষিক্ত হইল আর চারিদিক চাহিয়া সেই দীয়তাং ভুজ্যতাংএর রব ও সমাগতগণের আদর আপ্যায়ণের পদ্ধতি দেখিতে লাগিল। সবাই বাবুজীকি জয় আর রাণীমাইকি জয় বলিতেছে বটে। কেহ খাইতেছে কেহ বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে আর ব্রাহ্মণেরা পর্য্যাপ্ত বিদায়ে তুষ্ট হইতেছে সবই তাহাদের নামেই হইতেছে অথচ তাহারা এ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অভিষেকের কার্য্য চলিল। বিজয়ের পক্ষে বেশী হাঙ্গামা কিছু ছিল না কারণ সে পূর্ব্বেই একবার অভিষিক্ত হইয়াছিল নূতন করিয়া তাহার সংস্কার হইয়াছে। দরিয়া সম্বন্ধে সে সুবিধা হয় নাই তাহার সকলগুলি সংস্কারই করিতে হইল কাজেই দরিয়াকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কারণ তন্ত্র নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারী মনে করেন। অনেকক্ষণ হোমের আগুনের সম্মুখে থাকিয়া দুই জনে যেন লাল হইয়া উঠিল। যে চারিজন ব্রাহ্মণ কাজ করিতেছিলেন তাঁহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বাবাজী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, এবার তোমাদের শেষ সংস্কার বা শৈব বিবাহ হইবে তাহার পর পূর্ণাভিষেক করিয়া ছাড়িয়া

দিব। দরিয়া শুনিয়া ত হাসিয়াই আকুল, বলে আমার আবার বিয়ে। বিজয় বলিল, ও বিবাহে সতীনের জ্বালা নেই ভয় পাস্‌নে। যথারীতি শৈব বিবাহ হইল কিন্তু সেবার স্বয়ং বাবাজী মন্ত্র পড়াইতেছিলেন; এক একটা মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের যেন হৃদতন্ত্রী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যখন বিজয় দরিয়াকে জায়াপদে বরণ করিয়া কল-জননী বলিয়া আহ্বান করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন তখন বিজয়েরও কেমন একটা কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে,—সূর্য্যদেবকে পূর্ণার্ঘ্য দিয়া শাক্ত দম্পতি ঘরে উঠিলেন এবং সেইখানে বসিয়া গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন বাবাজী হাসিয়া বলিলেন,—"কি রে পাগলী! এইবার গান কর্‌তে পার্‌বি?" দরিয়া হাসিয়া বলিল, পারিব। খানিকটে চরু খেয়েছি বৈত নয়, আমি ভেবেছিলাম তান্ত্রিক প্রসাদ খেতে হবে, এ যে বৈষ্ণবের বাবা হয়ে গেল।

বাবাজী। তোদের বুঝি ধারণা মদ মাংস না হলে তন্ত্রের সাধনা বুঝি হয় না। তোদের ত আর তান্ত্রিক কল্লুম না বৈষ্ণব ছিলি, বৈষ্ণবই থাকিবি কেবল রমণীর রূপটি ঢাকা দিয়ে জননীকে ফোটাবার চেষ্টা কর্চ্ছি। কারণ নারীর রমণীয়তা শম্ভু নিশম্ভুও সহ্য করিতে পারেনি, মধু কৈটভও হার মেনেছিল সামান্য মানুষে তো সে তাল সামলাইতে পারে না। এক শ্রীভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ রূপে ব্রজধামে নারীকে রমণী বানাইয়া কেমন খেলা খেলিতে হয় তাহার নমুনা দেখাইয়া দিয়াছেন। সে লীলা দেখিবার ও শুনিবার জিনিষ, অনুকরণ করিবার নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেরাও হেয় হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালী জাতটাকেও মাটি করিয়া তুলিয়াছে। তোমার গুরু তোমার অনৈসর্গিক রূপ দেখিয়া তোমাতে

শ্রীমতীর ভাব ফুটাইবার চেষ্টায় ছিলেন হার মানিয়া পালাইয়াছেন সে জন্য আমাদের সকলের গুরু তাঁকে তিরস্কারও করিয়াছিলেন। এ যুগে মা হইতে জানিলেই জীবন সার্থক হইল। তুমি আমার আদরিণী উমা হয়ে বস মা। এই বলিয়া বাবাজী কমলাকান্তের সেই পুরাতন গানটি ধরিলেন—

আদর করে হৃদে রাখ
আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥

যে গানের সুর দরিয়ার শ্লাঘা ছিল, তেমনই চাঁচাছোলা পাপীয়ার কণ্ঠরবকে সপ্তমে চড়াইয়া বাবাজী এই গানটি করিলেন। দরিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র হইয়া বৃদ্ধ পুরুষের কণ্ঠে, ব্রহ্মচারিণী কিশোরীর বামা কণ্ঠের অপূর্ব্ব খেলা শুনিয়া যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল। বাবাজী অমনি সেই ছবিটি দেখিয়া হাত বাড়াইয়া বেহাগের তানে গান ধরিলেন—

কে রে মনমোহিনী ঐ

খেয়াল ভাঙ্গা গান যত রকম ওস্তাদি তাহাতে দেখাইতে হয় আলাপে ও মুর্চ্ছনায় সকল ওস্তাদী দেখাইয়া ও ফুটাইয়া বাবাজী এই গানটি শুনাইলেন। বিজয় ও দরিয়া দুই জনেই অবাক হইয়া রহিল, দরিয়ার দর্পচুর্ণ হইল। সে বাবাজীর চরণ ধরিয়া বলিল, ঠাকুর আমার অনেক অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা কর। আমি দিগম্বরী হইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াও এত জব্দ হই নাই। আমি কি গান করিব ঠাকুর তুমি যাহা বলিবে যাহা শুনাইবে আমি তাহারই অনুকরণ করিব। দাসীকে চরণে রাখিও আমি তোমার বাঁদী হইয়া রহিলাম।

বাবাজী।—বুঝলি বেটী, এ দুনিয়াটা প্রেমেরও নয় বিলাসেরও নয়, এ দুনিয়াটা কর্ম্মের, প্রেম ও বিলাস দুইটাই আনুসঙ্গিক। গ্রীষ্মকালে ঘামিতে হয় সেই ঘামের দোষে গাময় ঘামাচি বাহির হয়। ঘামাচি চুলকাইতে হয় বলিয়া সংসারে কোনও কর্ম্ম আটক থাকে কি? প্রেম ও বিলাস ঘামাচি চুলকায় মাত্র। যে চুলকায় না তাহার চুলকনা ফুটিয়া উঠিয়াই গায়ে শুকাইয়া যায়, যে চুলকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম করে, কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে অবহেলা করে না তাহার চুলকনা প্রথমে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া পরে চামড়ার সহিত মিশিয়া শুকাইয়া উঠিয়া যায়। আর যে সব ভুলিয়া কেবল চুলকায় এবং চুলকানির সুখে মুগ্ধ থাকে তাহার সে চুলকনা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতের আকারে পরিণত হয়, হরিনামের দদ্রুফস্তৃতিতে তাহার শরীর জীর্ণ হইয়া পড়ে। পার যদি চুলকওনা কিন্তু তা যদি না পার তবে, গন্ধক দিয়া চুলকাও দুবার সহিয়া একবার চুলকাও আর যখন ভগবানের কৃপা প্রথম আষাঢ়ের মেঘের আকারে তোমার উপর শতধারায় বর্ষিত হইবে তখন হাত পা ছাড়িয়া একবার সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া লইও ইহাই হইল সংসার ধর্ম্মের সার। ইহা ছাড়া বড় উপদেশ আমি দিতে পারি না।

দরিয়া ও বিজয় ঐ উপদেশ শুনিয়া গুরু চরণে আবার প্রণত হইল এবং উভয়েই সমস্বরে বলিল, এখন আমাদের প্রতি হুকুম কি? কি করিব, কোথায় যাইব?

বাবাজী।—প্রথমে হাবসী দর্শন করিতে যাইতে হইবে। সে না চুলকাইয়া কেমন আছে একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। সে তোমাকে সতীন পাইয়া কেমন ব্যবহার করে তাহার জাচাই করিয়া লইতে হইবে তার পর, আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া বাঙ্গলা দেশে তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া আসিব। আর তোমাদের পার্শ্বে সুকুমার সুকুমারীকে বসাইয়া আসিব। তথন বুঝিবে হাবসীর কেমন মহিমা সে কত দুর্ম্মূল্য নীলকান্তমণি। একবার আমার মাকে দেখিয়া আইস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিমালয় ক্রোড়ে।

আঃ মরি মরি পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপে স্তূপে চারিদিকে যেন কাচমকি সকল সাজান রহিয়াছে। হিমালয়ের ক্রোড়ে যেন শত সেফালী বালিকা বক্ষন্নত করিয়া মাতৃ ভাবের বিকাশ করিতেছে আর প্রথম প্রভাতে সূর্য্য কিরণ স্পর্শে সে অসংখ্য স্তনচূড়া হইতে পুণ্য পিযূষ ধারা রজতধারার ন্যায় গড়াইয়া পড়িতেছে এবং প্রত্যেক চুম্বনে নানা বর্ণের মণিমাণিক্য চারিদিকে বিস্ফুরিত হইতেছে। বর্ণের সাম্যের এই লীলা নিকেতনকে ভেদ করিয়া অলকানন্দা বন্ধুর পর্ব্বৎ গাত্রকে দীর্ঘ করিয়া কোটী স্বর্ণ কিঙ্কিণীর নাদে কলকল ছলছল করিয়া যাইতেছে আর সেই প্রথম প্রভাতের অরুণ প্লাবনকে যেন ঠেলিয়া তরঙ্গায়িত করিয়া এক দম্পতি অগ্রসর হইতেছেন। তাহারাও যেন এক জোড়া সজীব রূপ চলিয়াছে, জ্যোতি কণা যেন নরনারীর আকার ধারণ করিয়া তুষার ক্ষেত্রে পদাঙ্কচিহ্ন রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। বিজয় ও দরিয়া চৈত্রের গোড়াতেই দেব-প্রয়াগের পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবার শীতের প্রকোপ বেশী তথনও

হিমালয়ের নিম্ন স্তরের তুষার ক্ষেত্র গলে নাই বরং নিত্য তুষার পাতে তাহা যেন স্ফটিকশীলা বিস্তারের ন্যায় হইয়া আছে। দরিয়ার চূর্ণ কুন্তলের উপর নয়ন পল্লবের উপর নাশিকাগ্রে বিন্দু বিন্দু তুষার কণা জমিতেছে আর সে চঞ্চল হস্তে ঝাড়িয়া ফেলিতেছে ও হাসিতেছে বিজয় এক একবার তাহাই তাকাইয়া দেখিতেছে। কখনও কখনও কোকিল কণ্ঠে দরিয়া গান ধরিতেছে বিশেষতঃ সৈকতে বারি বিন্দুসম এই গানটি বারে বারে আবৃত্তি করিয়া হাসিতেছে।

এমন সময় দূর হইতে বামা কণ্ঠে আর একটা গান ফুটিয়া উঠিল। হিমালয়ের সে নিবীড় নিস্তব্ধতাকে যেন আন্দোলিত করিয়া আর একটা চাঁছা ছোলা মাজা ঘসা গলা তালে লয়ে ঝঙ্কারিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল—

ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক রাইএর কুঞ্জে আর এসনা।

গান শুনিয়া সত্যই উভয়ে থমকাইয়া দাঁড়াইল। বিজয় ভাবিল হাবসী এমন গান শিখিল কবে? দরিয়া ভাবিল সতীনগিরির এই নমুনা নাকি। এমন সময় সে কণ্ঠ নীরব হইল উভয়ে নির্নিমেষ নয়নে দেখিল, অগ্নি সংস্কৃত স্বর্ণ খণ্ডের ন্যায় এক গৈরিকধারিণী বালিকা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, গায়ে শীত বস্ত্রের লেশ মাত্র নাই, আছে কেবল রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে মণিবন্ধে বাহুতে মস্তকে কিরিটের আকারে আছে কেবল রুদ্রাক্ষের মালা আর আছে বিভূতির রাগ। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মের অনুলেপ কিন্তু সে ছাই ভেদ করিয়া সোনার বরণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি অলোকসামান্য দ্যুতী যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

দরিয়া। এ কি আমাদের হাবসী নাকি? কয়লা একেবারে হিরার টুকরা হয়ে উঠেছে যে?

হাবসী। সদগুরু পাওরে ভেদ বাতায়েৎ জ্ঞান করে উপদেশ।

তব্ কোর লাক ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ॥

যেন পিয়ানোর ঝঙ্কারের মত হাবসী এই দোঁহাটি আবৃত্তি করিল এবং তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া দরিয়ার চিবুক ধরিয়া বলিল,—হ্যাঁলো হ্যাঁ! তুই রূপসী বলে কি আর কারও রূপ ফুটতে নেই?

দরিয়া থতমত খাইয়া যেন ভুবার ঢোক গিলিয়া বলিল, দিদি এমনত দেখিনি, দেখিবি বলেই ত বলছি কাটকালা একেবারেই হীরে হল গা? তোমার গলার আওয়াজ না শুনলে তোমায় চিনতে পারতুম না। এতটা ভোল বদলালে কেমন করে?

হাবসী দরিয়ার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ লো হ্যাঁ, কতদিন আর্শীতে মুখ দেখিস্ নি বলদেখি? তুই যে আমার যুঁইএর গোড়ে হয়ে আসছিস। কেবল দুই গালে দুই থোকা রঙ্গন আছে মাত্র। বাজে বোকে কাজ নেই আয় আমার সঙ্গে আয়। আমাদের গুহায় বেশ গরম।" এই বলিয়া হাবসী দরিয়ার হাত ধরিল, যেন ভক্তি প্রেমকে টানিয়া নিজ নিকেতনে লইয়া গেল। নীরবে নির্ব্বাক হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় বিজয় এই দুই রূপদ্যুতির অনুসরণ করিলেন।

তিনজনে একটা বাঁক ঘুরিয়া অলকানন্দার পাড় হইতে একটু নামিয়া এক বিবর মুখে প্রবেশ করিলেন। বাহির হইতে দেখিলেই মনে হয় যেন একটা শৃগালের গর্ত্ত। কোনও রকমে বুকে হাঁটিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ। বিবরকে গহ্বর বলিয়া মনে হয়। হাঁটু গাড়িয়া কতকটা অগ্রসর হইলে তবে দাঁড়াইতে পারা যায়; ক্রমে গহ্বর প্রশস্ত হয়, ভিতর পরিস্ফুট হয়। তাহার মধ্যে অসংখ্য কক্ষ মাঝে মাঝে বড় বড় হল আর প্রত্যেক কক্ষেই জটাজুটধারী

এক একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। কোনও খানেই অগ্নির লেশমাত্র নাই বস্ত্র, ভৈষজ, পানপাত্র কিছুই নাই। এই সকল স্থান ছাড়িয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া একটা বড় গহ্বরে ইহারা প্রবেশ করিলেই সেখানে বিছানা পত্র আছে ভাল ভাল ভুসির কম্বল আছে, পান পত্র সকল রহিয়াছে, পানীয় জল মস্তাদিও সব সাজান রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে একটি ছোট কক্ষে রন্ধনের আয়োজনও আছে। বিজয় এই সব দেখিয়া বলিল "এ কি, এযে পাহাড়ের ভিতর একটা গ্রাম। হাবসী হাসিয়া বলিল "এমন অনেক আছে। ইহা ত নিম্নতম আশ্রম; যত উপরে উঠিবে ততই এমন ভাল ভাল আশ্রম দেখিতে পাইবে, তবে দেখিতে জানিতে হয়।"

বিজয়। এ আলো কোথা থেকে আসছে বলতে পার? বেশ একটু গরম হাওয়াও পাচ্ছি। গহ্বরের মধ্যে বাতাস আর আলো কেমন করে এল?

হাবসী। ইহার নির্ম্মাণ কৌশলই এমনি। এ ঘরটা পাহাড়ের একটা শেষ দিকে পার্শ্বেই একটা গভীর পথ আছে। এমনি ভিতরে ভিতরে অনেকদুর যাওয়া যায়। নেপাল রাজ্যে ত যাওয়া যায়ই। কারণ আমি গিয়াছি, তবে অন্যের মুখে শুনিয়াছি ব্যাস গুহার ভিতর দিয়া যাইলে চারি দিনে তীব্বতে গিয়া পৌছান যায়।

বাঃ বেশত! এই বলিয়া বিজয় সেই কক্ষে বসিয়া পড়িল হাবসী ক্ষণেক পরে তাহাদের জন্য চা, ছাতুর লিট্টি দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া দিল। সকলেই মুখ হাত পা ধুইয়া আহার করিলেন। অগ্নি সেবা করিয়া শীতের জড়তা দুর করিলেন। বেশী অগ্নি সেবা করিতে হইল না এক একটা লিট্টিতে দেড় ছটাক করিয়া ঘী ছিল তাহা উদরস্থ হইয়া দেহকে সজীব

করিয়া তুলিল। তখন হাবসী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে বসিল। বিজয় হাবসীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিল—সত্যই এতরূপ কোথা থেকে পেলে সাধের বৌ ?

হাবসী। রূপ ত পেয়েছি বলছ। সাধের বৌ বলে ত সোহাগ করা হচ্ছে, খোঁজ নিয়েছ কতটুকু ?

বিজয়। গুরু আজ্ঞা তাই পারিনি, কিন্তু তোমায় ভুলি নি।

হাবসী। মিন্সে গুলো হাতে নাতে ধরা পড়ে; তবু মিথ্যা কথা বলা ছাড়ে না। ভোলনি ত বলছ ঠাকুর। দরিয়ার কুকুরের সঙ্গে গায়ে গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলে কেন ? দরিয়ার জন্য অত মেতে উঠেছিলে কেন ? শেষে অমন করে গলার হার কল্লেই বা কোন লজ্জায়। আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই, আমার রাগও নেই ক্ষোভও নেই, আমি জানি সব। অমন করে গুরুর মনে কি বেদনা দিতে আছে ?

বিজয়। তুমি যদি সুকুমারীর মত ছেলের মা হইতে পারিতে তাহা হইলে মনে হয় এতটা হইত না।

হাবসী। কথায় আছে পাষণ্ডের ছলের অভাব হয় না। আমি মেয়েমানুষ হয়ে গুরু আজ্ঞা ষোল আনা পালন কর্ত্তে পেরেছি আর তুমি পাল্লে না ?

বিজয়। তুমি আছ কোথায় আর আমি ছিলাম কোথায়। অলকানন্দার তীরে থাকিলে সত্যই কয়লার টুকরা হীরে হয়! আর আমি ছিলাম এলাহাবাদে ও বাঙ্গলায়, স্থানের প্রভাব নাই কি ?

দরিয়া। সত্যই বলছি দিদি আমি তোমায় দেখে কেমন হয়ে গেছি। এই জন্যই বাবাজী বলেছিলেন আগে আমার মাকে দেখে আয়।

হাবসী। তাই নাকি? দেখলি ত এখন কি বলবি? "যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, সতীন মলে বাঁচি।"

দরিয়া। না তা নয় দিদি। তোমায় দেখে অবধি আমার হাত-পা বুদ্ধি প্রভৃতি সব যেন কচ্ছপের মত ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি কত ছোট কত দুর্ব্বল, কত সামান্য কতই হেয় তা তোমায় যত দেখছি ততই বুঝতে পাচ্ছি।

হাবসী। অত উতলা হ'ও না বোন। আমি তোমায় বহিনও বলি জননীও বলি। যাঁরা আলকাতরা রাঙ্গা করিতে পারেন, তাঁহারাই হাবসীকে অপরাজিতা বানাইয়াছেন। আমার সে খোলস খসিয়া গিয়াছে। আমাকে আর ভয় করিতে হবে না। এই বলিয়া বিজয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল তুমি সুখে থাক; দরিয়ার ক্রোড়ে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক কর। দেখ পত্নী প্রাণাধিক নহে, একটা গেলে আর একটা হয় কিন্তু আমাদের পুরাতন হিসাব মত পুত্র সত্যই প্রাণাধিক। সে কথাত বাবাজী তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন! আমার ঐ একটি সাধ বাকি আছে। দরিয়ার ছেলেকে, আমার শ্বশুরের বংশধরকে আমি মানুষ করিব। বাবাজী সে সাধ মিটাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। কথায় আছে না, সতীনের ছেলে হক দেইজীর ভাত হক আমি সেই কথারই আবৃত্তি করিয়া এই অতি পবিত্র তীর্থ স্থানে, সাধু মহাত্মার পুণ্যছত্র ক্ষেত্রে তোমাদিগকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

চকোর চকোরীর মত গলা উচু করিয়া, নির্নিমেষ নয়নে বিজয় ও দরিয়া হাবসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় বাহির হইতে একটা গম্ভীর শব্দ উঠিল মা "জননী উঠেছ মা তাঁরা এসেছেন" শব্দের সঙ্গে

সঙ্গে একটি পুরুষ আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ শীর্ণ জীর্ণ পুরুষ নহে—তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ—সুদৃঢ় পেশী-সংলগ্ন, পূর্ণ যৌবন লাবণ্য প্লাবনে প্লাবিত, পিঙ্গল কেশের নবীন জটায় মাথার উপর যেন সুবর্ণ চূড়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হরিণের ন্যায় নিত্য চঞ্চল বিস্ফারিত নয়ন যেন সৃষ্টি প্রহেলিকা দেখিবার জন্য প্রতি পলে অনুপলে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে মধ্যে শুকচঞ্চুর ন্যায় নাশাটি না থাকিলে যেন উভয়ে ঠোকাঠুকি লাগিত, নাসিকার নিম্নেই যেন কোঁদা দুইখানি প্রবাল যন্ত্রের ন্যায় অধরোষ্ঠ, টকটকে লাল হিঙ্গুল বর্ণের অধরোষ্ঠ কেবল যেন নড়িতেছে আর ফুলিতেছে। বিশাল বক্ষস্থলে কোনখানে এতটুকু চর্ব্বি নাই কিন্তু মাংশ পেশী এমনই সুবিন্যস্ত যে দেখিলেই মনে হয় প্রসান্ত সাগরের ন্যায় উহা যেন বিস্তারিত হইয়া আছে। আর কটিদেশ—পুরুষের কটি এমন হয়? ছার মৃগরাজের কটিদেশ। এলাহাবাদে অক্ষয় বটের নীচে দত্তাত্রেয়ের যে পাষাণ প্রতিমা আছে তাহার কটি যেমন সুন্দর যেমন শ্রীযুক্ত—এই সজীব দেহের কটিদেশ তেমনিই সুন্দর। উরু, জানু, চরণ, সবই যেন মাখনে মাজা মসৃন এবং সুকোমল। পুরুষের এত রূপ এক স্থানে সঞ্চিত আবৃত কখনও আমরা দেখি নাই। দেখিলে যেন মনে হয় এ যুগের মানুষ নয়। যে যুগে কষ্টি পাথর কাটিয়া বাঙ্গালী ভাস্কর পুরুষ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইতেন এ বুঝি সেই যুগে বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া এই নবীন কিশোরকে গড়িয়াছেন।

মা জননী উঠেছ মা? বলিয়াই সন্ন্যাসী যুবক ঘরে আসিলেন এবং হাবসীর কাছ ঘেসিয়া পিঠের দিকে আদুরে আব্দারে ছেলের মত পৃষ্ঠে-হাত দিয়া বসিলেন। আর যে দুজন লোক আছে তাহার প্রতি লক্ষই

নাই। মায়ের ছেলে মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। তাহার দেহ সৌষ্ঠব দেখিলে মনে হয় না সে সন্ন্যাসীর ছেলে, অনাহারে দিন কাটায়; বরং মনে হয় রাজপুত্র ভোগবিলাসে লালিত পালিত, সখ করিয়া সন্ন্যাসীর আকার ধারণ করিয়াছে। বালকের দেহে কিছুই নাই কোমরে একটি তামার শিকল জড়ান আছে সেই শিকলে মৃগাজিনের একটুকরা কৌপিনের আকারে জড়ান আছে। হাতে চিমটাও নাই দন্তও নাই।

হাবসী বালকের মাথায় হাত বুলাইয়া অহাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল এসেছ বাবা ভোর বেলা কোথায় ছিলে? ঐ দেখ উনি আমার সংসারাশ্রমের স্বামী, আর ইনি আমার সপত্নী। ইহাদিগকে অভি-বাদন করিলে না? বালক অমনি তাড়াতাড়ি মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া দুইজনকেই প্রণাম করিল। সে প্রণাম দরিয়া সহ্য করিতে পারিল না মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, সে প্রণাম বিজয়ও সহিতে পারিল না তাহার কপাল হইতে মুক্তা মালার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল সেও জ্ঞানহারা হইল। বালক কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আবার মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। ক্ষণেক পরে উভয়ের চৈতন্যোদয় হইল, হাবসী উভয়কেই আবার একটু দুগ্ধ খাইতে বলিল অনেক কষ্টে বিজয় আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিল, এমন ছেলের মা হয়েছে যে, তার আবার নূতন ছেলের আকাঙ্ক্ষা কেন?

হাবসী। এমন ছেলে আমার একটী নহে অনেকগুলি আছে। একে একে সবাই এসে জোটে দেখ না। বুড় ছেলেও কম নেই সব দেখতে পাবে। সব দেখিয়ে শুনিয়ে তবে আমি তোমাদের বিদায় দিব।

দরিয়া। তুমি যাবে না? আমরা একলা ফিরবো?

হাবসী। তোর যখন ছেলে কোলে হবে, তখন আমি গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হব। তদ্দিনে এরা সব মানুষ হয়ে উঠবে।

দরিয়া। এরা কারা দিদি? এ ছেলেটি কে? আ মরি মরি এমন রূপত আর কখনও দেখি নাই। তুই দেখছি না বিয়িয়ে কানাইএর মা হয়েছিস।

হাবসী। এরা সব এই পাহাড়েরই এবং নেপাল রাজ্যের ডোগরা ও গৌর ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। এদের মায়েরা মানত করেছিল প্রথম ছেলে হলে আমি সন্ন্যাসীদের দিব। সেই মানতের ফলে অনেক ছেলে এই সব আশ্রমে আসিয়া জোটে। এরা সব পুরুষানুক্রমিক সন্ন্যাসী। এই তোমার গুরুজী, দেহ রাখিবার পর এমনিই কোনও ব্রাহ্মণের গর্ভে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং এমনিভাবে পুরাতন গুরুর আশ্রমে আসিয়া পড়িবেন। বিমলানন্দ জন্মান্তরে বাঙ্গালী ছিল তাই বাঙ্গালাটা আমার কাছে, অনায়াসে শিখেছে, ষোল সতের বছরের ছেলে হল এখনও আমার আঁচল ধরিয়া বেড়ায় এবং আদর আব্দার করে কিন্তু বহু জন্মের সঞ্চিত তপরাশিও ক্ষয় হয় নাই। ইহার সঞ্চিত আত্মশক্তিও অসাধারণ। ওর মা হয়েই আমিও ফর্সা হয়ে পড়েছি।

দরিয়া। ভাবতাম রূপ বুঝি মেয়ে মানুষেরই এক চেটে। এখন দেখছি তা নয় রূপ পুরুষেরই একচেটে ছার রমণীর রূপ।

হাবসী। ঠিক বলেছিস। ছার রমণীরূপই বটে। কিন্তু জননীর রূপ সনাতন যুগে যুগে একই রকম রয়ে গিয়েছে। বুঝলি ব্যাপারটা কি।

বিজয় আর দরিয়া কোনও কথা বলিতে পারিল না কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একে একে বিমলানন্দের খেলুড়ে, সঙ্গী, সহতীর্থ সব

আসিল। সবাই যেন এক ছাঁচে ঢালা, এক রকমের এক আকারের। কেবল বর্ণ বৈষম্যই আছে ; কেহ বা তুহীন ধরণ কেহ বা রক্তাভ, কেহ বা পীতাভ কেহ বা শ্যাম বর্ণ। তাহারা সবাই আসিয়া হুলাহুলী করিল, আহারের জন্য আব্দার করিয়া হাবসীকে টানিয়া লইয়া গেল, হাসিমুখে হাবসী উঠিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল কি দেখছ দরিয়া? দরিয়া বলিল, যাহা দেখি নাই। সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিল কি দেখছ বিজয়? বিজয় বলিল, যাহা ভাবি নাই। কল্পনার স্বপ্নের অতীত যাহা তাহাই দেখিতেছি। ধন্য আমি যে এমনটি দেখিলাম এবং এমন নারীর পতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঘরকন্না।

সুকুমার কাশীতেই ঘরকন্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চৌষট্টি যোগিণীর ঘাটের উপর একটি বাড়ী লইয়াছে, সেই বাড়ীতেই সুকুমারী নন্দকে লইয়া বাস করেন, তবে গৃহস্থের পোষাক তিনি পরেন নাই, তিনি যেমন গৈরিকধারী সুকুমারীও তেমনি গৈরিকধারিণী। নন্দও কাষায় ছাড়া অন্য কিছু পরে না। বাবাজীর একজন শিষ্য তাহাদের সঙ্গে থাকে দেখে শুনে চৌকী দেয়। সুকুমার রাত্রিদিন সকাল সন্ধ্যা স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কাছে যাইয়া বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। তদগত চিত্তে তন্ময় হইয়া শাস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নন্দ কি করিতেছে, কি শিখিতেছে

তাহারও খবর লইয়া থাকেন। সে সময়ে কাশীতে সামান্য টাকা হইলেই সুখে দিন চলিত, সুকুমারের তিন চারি শত টাকা মাসিক আয় ছিল, ইচ্ছা করিলে সে বাবুয়ানা করিয়া দিন কাটাইতে পারিত কিন্তু কুড়ি পঁচিশ টাকার মধ্যে সুকুমারীর গৃহিণীপনার গুণে সংসারযাত্রা সুখে অতিবাহিত হইত, বাকি টাকা সঞ্চয়ই হইতেছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে সুকুমার বসিয়া আছেন, সুকুমারী একটা রুদ্রাক্ষের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে মাথা হেট করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, দাদার আর বৌএর খবর কিছু রাখ, হনুমানদাস বলছিল তারা নাকি কাশীতে আসবে।"

সুকুমার। না। কোনও খবরই ত পাইনি, রাখিওনি। কখনই বা রাখি, স্বামিজী অন্য চিন্তার অবসরই দেন না। একদিকে বিশুদ্ধানন্দ অন্য দিকে রামানন্দ, দুই দিকে দুইটা সিংহ শার্দ্দূল, আর আমি বাঙ্গালী বাবু, পাঠ নিচ্ছি বেদান্তের। কাজেই মাথা চুলকাইবার অবসর পর্য্যন্ত পাই না।

সুকুমারী। অত সব ছাই ভস্ম শিখেই বা কি কচ্ছ? এম, এ, বি, এল, হলে উকিল হলে, বিলাতে গেলে, ইয়োরোপের তিনটে বড় ভাষা শিখলে তারপর এখানে এসে কেঁচে গণ্ডুষ করে সংস্কৃত শিখলে, শেষে বেদান্ত পাঠ কচ্ছ। বয়স ত চারের কোটায় এসে পৌঁছিল, এত লেখাপড়া শিখে ঘোড়ার ডিম হবে কি?

সুকুমার। এম, এ, বি, এল, হয়েছিলাম উকিল হব, পয়সা রোজগার কর্ব্বো সেই সাধে, সে সাধ কতকটা মিটিয়াছিল। মায়ের আর তোমারও সে সাধ কতকটা মিটাইয়াছিলাম। তারপর সাহেব হব তোমাকে বিবি বানাব এই সাধে বিলেত গিয়েছিলাম, বিধাতার চক্রে পড়ে জাহাজ ডুবি হলাম, ইয়োরোপের বিপ্লববাদের আবর্ত্তে পড়লাম, সেই নিহিলিষ্ট মাগীর

পাল্লায় পড়ে ফরাসী জার্ম্মাণ ও রুষ ভাষা শিক্ষা করলাম, তোমাকেও কতকটা বিবি বানাইয়া ছিলাম। কিন্তু তুমি পুরাদস্তুর বিবি হইলে না, শেষে সন্ন্যাসীদের পাল্লায় পড়ে, সংস্কৃত শিখেছি বেদান্ত পড়ছি।

সুকুমারী। গোড়ায় তবুও একটা উদ্দেশ্য ছিল—টাকা রোজগার। এখন কি উদ্দেশ্য ?

সুকুমার। হাঁ, গোড়ায় উদ্দেশ্য ছিল বাবুগিরি বিলাস ও টাকা রোজগার, সেই উদ্দেশ্যের তাড়নায় বিলাত গমন ও ব্যারিষ্টার হওয়া, মাঝে কেবল প্রেমের পাল্লায় পড়িয়া ভাষা শিখিয়াছিলাম, তারপর পদ্মার পাটে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। যা বলছে তাই কচ্ছি। সত্যই সুকুমারী আমি একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছি। জীবনের সাধ এখনও মেটে নাই, তবে এইটুকু বুঝিয়াছি যে সব সাধ মিটাইতে হইলে যে পুরুষকারের প্রয়োজন তাহা আমার নাই।

সুকুমারী। গুরু মন্ত্র জপ কর না, আপনিই বুদ্ধি খুলবে, নিজে নিজেই সব বুঝতে শিখবে।

সুকুমার। তা কি বন্ধ আছে ! তা বন্ধ নেই এবং তারই প্রভাবে দুটো বাঘাভালকো স্বামীর কাছে বসে বেদান্ত চর্চ্চা করতে পাচ্ছি।

সুকুমারী। হুঁ, শেষে কি করবে।

সুকুমার। সে ভাবনা আমার নাই। গুরু যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আমার যেন মনে হয় জন্মাবধি যৌবন পর্য্যন্ত যে ইংরেজি শিখেছি, এবং কেঙলার মত যে সকল বিলিতি সংস্কার মনের মধ্যে একে রেখেছিলাম সে সব মুছে ফেলবার জন্য ঠাকুরের এই আয়োজন। শেষে তুমি আমি দুই জনে আবার দেশে যাব, ব্রাহ্মণ গৃহস্থ কেমন ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ

করে তার আদর্শ দেখাব। তোমার মত পত্নী যার—শক্তি তাহার, ভাবনা কি আছে তার।

কিছু নাই। এই সার সত্যটি যদি দৃঢ় করে হৃদয়ে ধরতে পার তা হলে তোমার কল্যাণ হবে। এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া স্বামী রামানন্দ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুকুমারীর দিকে তাকাইয়া বলি-লেন, মা আজ তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে। এইবার নন্দকে কিছু দিনের জন্য হৃষিকেশে বা দেবপ্রয়াগে পাঠাইতে হইবে। তাহাকে বেদ পড়াইতে হইবে। কাশীর বেদপাঠের পদ্ধতিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঢুকিয়াছে তাই নন্দকে বড় আড্ডায় পাঠাইয়া দিতে চাই। কি বল ?

সুকুমার। নন্দ কি একা থাকতে পারবে ? নইলে আপনি যখন বলছেন তাতে আর আপত্তি কি ?

স্বামিজী। নন্দ তার মামীর কাছে থাকবে গো। এক বৎসর থেকে কেবল বেদ পাঠের পদ্ধতিটা শিখে আসবে।

সুকুমারী। আর আমরা কোথায় থাকবো। আমরাও সঙ্গে যাই না কেন ? আমার পক্ষে যেখানে নন্দ সেই খানেই কাশী।

স্বামীজি। তা মন্দ পরামর্শ নয়। তবে ভাবনা সে শীত তোমরা সইতে পারবে ?

সুকুমারী। তা বেশ পারবো। হাবসী পারে আর আমি পারবো না ?

সুকুমার। বাপ বেটা দুজনেই ত ছাত্র বিদ্যার্থী, আমিও না হয় নন্দের সঙ্গে নন্দ হয়ে কিছু শিখে আসি। অনুমতি করেন ত কৃতার্থ হই।

স্বামীজি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, তবে তাই হইবে। এই বৈশাখী পূর্ণিমার পরই তোমরা যাইবে। ইতিমধ্যে সকল জোগাড় যন্ত্র করিয়া রাখ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিমালয়ে।

আজ দেবী অপরাজিতার আনন্দের সীমা নাই। ননদ, নন্দাই ভাগিনেয় তাহার ইহসংসারের সর্ব্বস্বই তাহার আশ্রমে আসিয়াছে। বিমলানন্দ নন্দকে কাঁধে করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিরা বেড়াইতেছে এবং নানাস্থান দেখাইতেছে। কত সন্ন্যাসীর আড্ডায় লইয়া যাইতেছে এবং বড় বড় সাধু মহাত্মা সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিতেছে। বিমলানন্দ এবং তাহার সহতীর্থদিগের স্নেহের গুণে নন্দ বাপ মাকেও কতকটা ভুলিয়াছে। সুকুমারী নির্দ্দিষ্ট গুহাটি দখল করিয়া সেখানে পরিপাটীরূপে ঘর সংসার পাতাইয়াছেন। এবং দুই এক দিনের মধ্যেই সাধুসন্ন্যাসীদের মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। সুকুমার সন্ন্যাসীদের আড্ডায় গিয়া মিশিয়াছেন। এই সব দেখিয়া একদিন অপরাজিতা বা হাবসী বলিল, তবে আর কেন, আমি ব্যাসগুহা প্রভৃতি দুর্গম তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়া আসি। তুমি ঠাকুরঝি বেমালুম আমার স্থান অধিকার করিয়াছ আর আমার এখানে থাকার প্রয়োজন কি?

সুকুমারী। নে ন্যাকামী রাখ। এখন বল দেখি দাদা দরিয়াকে লইয়া গেল কোথায়?

হাবসী। বাবাজী তাদের দুই জনকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় নেপালের পথে বাঙ্গলায় যাইবেন, অথবা কামরূপ কামাখ্যার দিকে যাইতেও পারেন। আমি ইহার বাড়া আর কিছু জানি না।

সুকুমারী। তাই ত আমি কোথায় তাদের দেখব বলে এলাম, আর তারা আগে ভাগেই চলে গিয়েছে।

হাবসী। বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ব্বে আসিলে দেখা পাইতে। তাহারা তৃতীয়ার দিন যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সুকুমারী। তুই ছাড়লি কেন? সঙ্গে গেলি না কেন?

হাবসী। তুমি ঠাকরুণ আসবে বলেই ত রইলাম। নন্দর মুখখানা অনেক দিন দেখি নি। সে লোভও ছিল। তাহার উপর, আমায় ত আর স্বামীর ঘর কর্ত্তে যেতে হবে না। কর্ত্তাদের হুকুম দরিয়ার পেটে ছেলে হইলে আমি সেই ছেলে মানুষ করিতে আবার স্বামী গৃহে যাইবার অধিকারিণী হইব।

সুকুমারী। মরণ আর কি! আবার সাধুভাষা হচ্ছে। সোজা করে বল না ব্যাপারখানা কি?

হাবসী। যা বলেছি তা ছাড়া আর কিছু বলবার নেই। ওলো আমি কি আর মেয়ে মানুষ আছি, আমি এই উগ্র সন্ন্যাসীদের পাল্লায় পড়ে পুরুষ হয়েছি। সে সাধ বাসনা সে দাবী দাওয়া আমার কিছুই নাই। এখানে ছেলেগুলোর মা হয়ে আছি। বুড়ো স্থবির হাজার বছুরে পুরাণ সন্ন্যাসীদের খাইয়ে ধুইয়ে দেই, আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। পাহাড়ীদের গ্রামে গ্রামে যাইয়া তাহাদের ঘর সংসার দেখিয়া আসি। তোকেও এই সব কাজ কর্ত্তে হবে। তা দিন কতক শিক্ষানবিশী আমার সঙ্গে কর, আমি না হয় পূজার পর আশ্বিন মাসে চলে যাব।

সুকুমারী। যাবি কোথায়?

হাবসী। যেখানে দু'চোখ যায়। যেখানে গুরু আজ্ঞা হয়। সত্যই বলছি আমি আর মানুষ নেই কাঠের পুতুল হয়েছি।

সুকুমারী। একটা কথা বলতে পারিস? দরিয়া তোর সতীনগিরি কচ্ছে কেমন? পোড়ারমুখী দিন কতক কর্ত্তার ওপরও ঝুঁকেছিল। ঐ ছুড়ির জন্যই ত কর্ত্তা সন্ন্যাসী হলেন। সত্যি ভাই আমার একটু ভয় হয়েছিল। আবার ঐ সাপিনীর পাল্লায় পড়ে মিন্সেটা কি রকম হয়ে যায়, সে ভাবনাও মনে জেগেছিল।

হাবসী। দরিয়া আর সে দরিয়া নেই, সে এক নূতন মানুষ হয়েছে। এখানে থাক্‌তে কেবল গান করে বেড়াত আর পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটোছুটি করত। তোর মনের ভাব স্বামীজি টের পেয়েছিলেন তাই তাকে চোখের আড়াল করে তবে তোদের এখানে পাঠিয়েছেন। দরিয়া সত্যই খাসা মেয়ে হয়েছে। নাচতে গাইতে যেমন পটু, রাঁধতে বাড়তেও তেমনি, তার উপর সেবা শুশ্রূষাও বেশ জানে। আর কি গতর ভাই, হাজত না মঙ্গত না, তার হিংসা, বিদ্বেষ কিছু ছিল না; আমার কাছে স্বামী ছেড়ে দিয়ে আড়ি পর্য্যন্ত পাতত না। আর আড়ি পাতবার আছেই বা কি।

সুকুমারী। তা বটে! তোরও নেই আমারও নেই, মিন্সের ভয়েই হয় ত ঠাকুর আমাদের বৈশাখী পূর্ণিমার পর এখানে পাঠিয়েছেন। যা'উক সে ভাবনা নাই। নন্দ আমার যে এখানে এসে হাঁদায়নি এইটেই বড় সুখের কথা। তোর এই ছেলে কয়টি বেশ।

হাবসী। কটি কি লো? আমার একশ আট ছেলে। এমন অনেক আড্ডা আছে। এ সব পাহাড় উপরে নির্জ্জন ভিতরে ভিতরে মানুষ ভরা। তোকে দেখিয়ে আনব এখন। যিনি এলাহাবাদে গিয়েছিলেন তিনি ঐ উচ্চ গিরি চুড়ার ভিতরে বাস করেন। সব দেখবি সব বুঝবি তবে ত আমি যেতে পাব। নন্দ এক নূতন দুনিয়ায় এসেছে। যা দেখেনি যা দেখবে

না তাই দেখছে। তার ভাবনা তোর নেই, তার জন্ম যারা ভাববার তারাই ভাবছে।

সুকুমার ও সুকুমারী দেব-প্রয়াগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সকল আড্ডা সকল আস্তানা দেখিলেন। সকলের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের কার্য্যভার বুঝিয়া লইলেন, এক অপূর্ব্ব শান্তি তৃপ্তি ও তুষ্টি আসিয়া যেন স্থান মাহাত্ম্যে তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সুকুমারী অপূর্ব্ব সুন্দরী, দশ দিন বাস করিতে না করিতে তাঁহার আকার দেববালার ন্যায় হইয়া উঠিল। বড় সন্ন্যাসী তাঁহাকে সোহাগ করিয়া উমা বলিয়া ডাকিতেন। নন্দ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া অষ্টাধ্যায়ী ভাষ্য ও বার্ত্তিক সমেত পড়িতে লাগিল। নন্দের পিতা সুকুমারও পুত্রের সহতীর্থ হইলেন। শান্তিময় নিকেতনে শান্তির আশ্রয়ে এই ব্রাহ্মণ দম্পতি নির্দ্বন্দ্বে শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি।

এরা কারা? বল্কলের বাস, বল্কলের আচ্ছাদনে দেহাচ্ছদন করিয়া কে এই নর নারী ব্রহ্মপুত্রের সিকতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, অতি দুরন্ত কান্তার চারিদিকে পাঁচ শত ক্রোশের মধ্যে মনুষ্যের আবাসভূমি পর্য্যন্ত নাই, পিপাসায় ছাতি ফাটিলেও এক বিন্দু জল পাইবার উপায় নাই।

ঐ দূরে অতি দূরে নীল রেখার মত ব্রহ্মপুত্র আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে, উপরে তটভূমি পর্য্যন্ত যাইতে হইলে আরও এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ বালি ভাঙ্গিতে হইবে কিন্তু এ দম্পতির কোনও দিকেই দৃষ্টি নাই, অক্লান্তভাবে হাসি মুখে চলিয়াছে, পুরুষের হাতে একটি ত্রিশূল, নারীর হাতে একটি ঘটি পর্য্যন্তও নাই ঝুলি কাঁথা কম্বল ত দূরের কথা। অথচ দেখিলে মনে হয় ইহারা ক্লান্ত পথিক নহে, পথশ্রান্তির কোনও লক্ষণই ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট নহে। রমণী সহসা বলিয়া উঠিল দূর মিন্‌সে চুপ করে এগুতে পারিনে, একটা গান ধ'র।' পুরুষ বলিল তুমি গান ধরলে এই বালির ভেতর থেকে মানুষ গজিয়ে উঠবে, কেন আর ঝঞ্ঝাট বাধাও।

নাঃ আমার গান পেয়েছে। আমি গান গাহিবই, এই বলিয়া রমণী গান ধরিল—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ন তারা॥
গেহ মাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হল আঁখি॥

পুরুষ। দেখদেখিনি ভাল বিপদ। এই ত্রিপান্তর মাঠে চারিদিকে ধূ ধূ কচ্ছে, একটা আবরণ আচ্ছাদন নেই এখানে কি না গান ধরে দিলে। তোর পাগলামীর জ্বালায় অস্থির হলাম।

নারী। এ পাগলি সঙ্গে না থাকলে সেই দেবপ্রয়াগ হতে, পাহাড়ে পাহাড়ে মহাকালের মন্দির পর্য্যন্ত কি যেতে পার্ত্তে না এই কালাজ্বরের আড্ডা গোয়ালপাড়া ভেদ করে ব্রহ্মপুত্র দেখতে পেতে। গানের চোটে ভিক্ষে না করে ভিক্ষে পেয়েছি। তবে গাই—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অবমঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

পুরুষ। তা বটে তোমার গানে অনেক দুঃখ দূর হয়েছে। ভিক্ষা না করে ভিক্ষা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তবুত একটা দেশ কাল বিবেচনা কর্ত্তে হয়। আর কেবলি পদাবলি গাও কেন?

নারী। তুমি নর, আমি নারী, তুমি শিব আমি শক্তি, তুমি কৃষ্ণ আমি রাধা। পদাবলী ছাড়া অন্য গান কি গাইতে আছে।

পুরুষ। উহু, হল না। আমি ময়লা কাপড়ের বোঝা তুমি গাধা।

নারী। ঘাটে পৌঁছে দিয়ে কিন্তু আর আমি রইব না। যখন ধোপার ঘাটে আছাড় খাবে তখন আমি দূর থেকে দেখব।

পুরুষ। তা ত আগা গোড়াই দেখছ। সে দেখার সাধ কি এখনও মেটে নাই।

এইবার দরিয়ার চোখে জল আসিল, অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, জয় মা আনন্দময়ী তোমার মেয়েকে টানিয়া লও, আর এ খোঁটা সইতে পারি না।

বিজয় এই কয়টি কথা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, এততেও তোমার চামড়া মোটা হ'ল না। তুমি যাহা সহিয়াছ, যাহা সহিতেছ তাহা নারীর ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই। কোথায় দেবপ্রয়াগ ও ব্যাস গুহা, কোথায় তীব্বৎ ও নেপাল, আর কোথায় ভুটান ও আসাম, যুথিক স্তবক তুমি এই দুর্গম পথটা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছ। বুলবুলের মতন নাচিয়া নাচিয়া গান করিয়া এই পথটা কাটাইয়া দিয়াছ তথাপি আমার কথা তোমার এখনও বিঁধে। হায় বিধাতা নারী নারীই থাকিবে, কর্ত্তাদের এত কারচুপী সত্ত্বেও অবলা অবলাই রহিল। দরিয়া হরিনীর ন্যায় উদাগ্রীব হইয়া বিজয়ের মুখের দিকে তাকাইল তাহার দুই চক্ষের কোন দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, ভাবে বিভোর হইয়া গান ধরিল—

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল যেহা॥
থেছা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ, জিনিয়া করীশুণ্ড॥

গানের ঝঙ্কারে সত্যই যেন কোথা হইতে নরনারী আসিয়া জুটিল, "বাবাজী এসেছেন, মা এসেছেন" বলিয়া শব্দ করিতে করিতে তাহারা

তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, অল্প দূরেই ব্রহ্মপুত্র ঘাটে যাইয়া উভয়েই এক খানা নৌকায় উঠিয়া বসিল। মাঝি ইঙ্গিত মাত্রই নৌকা ছাড়িয়া দিল। দরিয়া ও বিজয় উভয়েই কামাক্ষা মাতা দর্শনের জন্য নদীতে ভাসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত কুটিরে।

এক খানি ছোট বাড়ীর একটি ছোট ঘরে বিজয় দরিয়া ও অঘোরীবাবা বসিয়া আছেন, দরিয়া বাবাজীর কোলের কাছে বসিয়া দুই হাতে মুখ খানি চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, বিজয় গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে তাহারও চোখে একটু জল দেখা দিয়াছে। হাসিয়া বাবাজী বলিলেন, কাঁদিলে কাটিলে কি হবে মা আমাকে যেতেই হবে। তোমাদের সহিত আর দেখা হবে না, জগতে কি চিরদিন কিছু থাকে তার জন্য এত দুঃখ কিসের ?

দরিয়া। আমার যে আর কেউ নেই। আদর সোহাগ করিবার আর কেউ নেই। সংসারে স্থিতু হইবার আগেই যার আদরে আদরিণী আমি তিনি চলে যাচ্ছেন। যার কৃপায় আমি কুল পেয়েছি, তিনিই ছেড়ে পালাচ্ছেন, আমি কাঁদব নাত কাঁদবে কে ?

বাবাজী। দূরঃ পাগলী! ও সব কথা বলতে নেই। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি বছরের মধ্যেই তুই ছেলের মা হবি, সেই কচি ছেলে কোলে করে এই

বুড়ো ছেলেকে ভুলে যাবি। তবে তোদের দেখবার লোক থাকবে ভাবিস্‌নে যে একেবারে অনাথ করে চলে যাব। গুরু তা কর্ত্তে পারে না।

বিজয়। কেবল ঘুরে বেড়ালাম কেবল ধাক্কা খেলাম, কেবল গোটা-কতক অভ্যাস অভ্যস্ত হলাম কিন্তু ঠাকুর এখনও ত মন ঠিক কর্ত্তে পারলাম না।

বাবাজী। বিজয় তোমায় দুটো কথা শোনাব। যেমন সাপকে সাপের বিষ ছাড়ান যায় না তেমনি নারীকে অভিমান শূন্য করা যায় না। আদ্যা-শক্তি জননী তিনিও অভিমানিনী আর সে অভিমান শিবকেও শবাকারে সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহা যে না পারে সে পুরুষ পুরুষই নয়। তোমা-দেরও বলে রেখেছি, মুক্তির টুক্তির ভাবনা এখন ভেবনা, এখন কেবল গৃহস্থলীর ভাবনা ভাবিবে, কেমন করিয়া সৎ পুত্রের পিতা হইতে পার, আদর্শ গৃহস্থ হইতে পার, তাহারই চেষ্টা করিবে। দেখ ইয়ুরোপের লোকেরা নারীর এই তত্ত্বটুকু জানে না, তাহারা লম্পটের হিসাবে নারী পূজা করে তাই তাহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিপ্লব বিদ্রোহ মার কাট ঘটে। তাহারা যে দিন নারীর মধ্যে জগতজননীর শক্তি দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে, সেই দিন তাহারা গৃহস্থ হইবে। বিলাতী বিদ্যাটা যেন মারকুলীর বিষের মত, একবার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহাকে ঝাড়িয়া বাহির করা কঠিন হয়। এত করিয়াও এত পোড় খাওয়াইয়াও তোমাদের বিলাতী ভাবটা দূর করিতে পারিলাম না। এই যে তোমার অশান্তি অতৃপ্তি ইহাও সাহেবিয়ানা মন্ত্রের ফল। আমরা কি কর্ত্তে চাই জান, এই সাহেবিয়ানা মন্ত্রের ফলে ইয়ুরোপের নকল-নবিশীর ফলে আমাদের দেশেও একটা ছোটখাট রকমের বিপ্লব বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, সে সময় দুচারিটা আদর্শ গৃহস্থ থাকিলে তাহাদেরই চারি-

পর্শে আবার একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গলায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আমদানীর গল্পটা জান ত। ঘোর বৌদ্ধ বিপ্লবের পর সমাজকে ঠিকমত গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার পরবর্ত্তী মোগল পাঠাণের অত্যাচারে একটা কর্ম্মের ও ধর্ম্মের আবরণ দিবার জন্যই ইহাদিগকে আমদানী করা হইয়াছিল। এখন ত আর সে কান্যকুব্জও নাই, হিন্দুত্বের সে আকরও নাই, যাহা একটু আধটু আছে নগরাজ হিমালয়ের কুক্ষিগত হইয়া লুকাইয়া আছে সে নমুনা তোমাদের দেখাইয়া আনিয়াছি। প্রয়োজন হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার বাঙ্গলা দেশে নামিয়া সমাজ গড়নের কাজে সহায়তা করিবেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষে গোটাকতক দাঁড়াইবার স্থানও গড়িয়া দিতে হয়। তাই এই চেষ্টা। তুমি একা কেউ নও বিজয়, তুমি তোমার নিজের কথা এত ভাব কেন? সর্ব্বদা এইটুকু চিন্তা করিবে যে বিধাতার কৃপায়, তোমার পিতৃ পিতামহের সে পুরাতনজীর্ণ মন্দির একবারে ধসিয়া পড়িয়াছে আবার তোমাকে তাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। দুইখানা ইটও যদি গাঁথিয়া যাইতে পার তাহা হইলে জীবন সার্থক হইবে মনে করিও। আমি তোমাদের মধ্যে সে গড়নের যোগ্যতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বিজয়। এইজন্যই কি একটা গুজরাটি মেয়ে আমার ঘাড়ে চাপাইলেন। তাতেও আবার মুসলমান প্রলেপ আছে।

বাবাজী। হাঁ তাই বটে! মনে রাখিও শাস্ত্রবাক্য কথনই মিথ্যা হয় না। শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা সবই সত্য এ ভাষা তুমি বুঝিতে না পার তোমার বোকামী। শাস্ত্র বাঙ্গলা গুজরাট মহারাষ্ট্র পঞ্জাব মানে না, ছত্রিশ জাত মানে না। আগে ছত্রিশ ভাঙ্গিয়া চার পরিণত কর তাহার পর চার ভাঙ্গিয়া এক হইবে। তারপর আর মুসলমাকে ত ছাড়িতে পারিবে না।

ইসলামের মধ্যেও তন্ত্রধর্ম্ম আছে বাঙ্গলায় পূর্ব্বকালে বড় বড় তান্ত্রিক মুসলমান জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলায় এমন এক সময় আসিয়াছিল যদি ঠিক সেই সময় মানসিং আসিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা না হইত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রবল না হইত তাহা হইলে তন্ত্রের ক্রোড়ে হিন্দুমুসলমান এক হইয়া যাইত। পরেও প্রায় অনেকটা এক হইয়াছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া আচার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে পক্ষে কতকটা বাধা ঘটাইয়া গিয়াছেন মনে হয় আবার সেই চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা হউক সে সব ত পরের কথা আর সে চিন্তা অন্যে করিতেছে। তোমাকে ভাঙ্গিয়া গড়িলাম অনেক দেখিলাম অনেক বুঝাইলাম দুই রকমের দুই শক্তি তোমাকে দিয়া গেলাম। এইবার বাবা আদর্শ গৃহস্থ হও, আদর্শশক্তি সাধক হও। তাহা হইলেই আমাকে গুরু দক্ষিণা দেওয়া হইবে। তোমরা যেমন এক জায়গায় আড্ডা করিয়া বসিবে সুকুমার ও সুকুমারীকেও তেমনি আর একস্থানে বসান হইবে। জান ত এই রকমের কাজ অনেক সন্ন্যাসী অনেক সাধু করিতেছেন। বাঙ্গালীর গুরুর আসনে একে একে নানা রকমের সন্ন্যাসী হইয়া বসিতেছে। জান ত আমরা সন্ন্যাসীর দলের কেহই কোন খেয়ালে কাজ করি না গোড়ায় একটা বড় মতলব আঁটা থাকে তারপর সেই মতলব অনুসারে আমরা নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নানা রকমে কাজ করি। মূলে কিন্তু আমরা সবাই এক। এটুকু ত বুঝিয়াছ এইবার নির্মৎসর হইয়া দেশের ও সমাজের জাতীর ও ধর্ম্মের কাজ কর এ ফকিরের সাধ পূর্ণ হউক।

বলিতে বলিতে বাবাজীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। অনেক পরে আবার বলিতে লাগিলেন, বাবা,

আমরা মুক্তি টুক্তি বুঝিনে। আমরা সন্ন্যাসী হইয়াছি সমাজের জন্য দেশের জন্য। সম্মুখে যে কাজ সে বড় উৎকট কাজ এক জীবনে সে কর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না, একদেহেও হয় না, তাই আমরা অসংখ্য সন্ন্যাসী কখনও বা গৃহীর রূপে, কখনও বা নানা সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী রূপে আসিতেছি যাইতেছি আর কাজ করিতেছি। মাঝে মাঝে প্রকৃতির নিয়মে দেহটা জীর্ণ হইলে খোলসটা বদলাইয়াও আসিতেছি। অনাদিকাল হইতে এই কাজই চলিতেছে। অনাদিকাল পর্য্যন্ত এই কাজই চলিবে। যত নিখুঁত করিয়াই সমাজ গড়ি না কেন তাহা হইতে ত্রুটি বাহির হইবেই তাই গড়ন ও সংস্করণের কাজ, অনবরত চলিতেছে। আমাদের কেবল কর্ম্মে অধিকার, কেবল কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছি, কর্ম্মের খাতিরেই যাতায়াত করিতেছি। আমাদের কাহারই বিশ্রাম নাই শান্তিও নাই। আশীর্ব্বাদ করি আমাদের মত তোমরা হও। আমরাও শক্তি শূন্য নহি কৃপা হইলে পরে সে খবরও জানিতে পার। এইবার বিদায় দাও আমি যাই। তোমরা কালই কলিকাতা যাত্রা করিও। সেখানে তোমার জন্য অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে যাইলেই কাজ পাইবে কোনও চিন্তা নাই। যতদিন পুত্রমুখ দর্শন না কর ততদিন কলিকাতায় থাকিও। এইবার বিদায় দে মা! আমার ভাবের দরিয়া সাধের দরিয়া এইবার বিদায় দে মা। মনে করিসনে যে আমাদের মায়া মমতা নেই, আমরাও ছেলে ছিলাম স্বামী ছিলাম, পুত্রকন্যার পিতামাতা ছিলাম, এক এক দেহে এক এক রসাস্বাদ করিয়াছি। এইবার বল মা আমি বিদায় হই।

এইটুকু গদগদ কণ্ঠে বলিয়া বাবাজী সাদরে সস্নেহে দরিয়ার চিবুক ধরিয়া এই গানটি ধরিলেন—

দরিয়া

কে নাম রেখেছে ত্রিগুণ ধারিণী।
কে নাম দিয়েছে জীবনিস্তারিণী॥
ওমা মা হ'তে কি মা নাম কাছে উমা
হয়েছে এত আদরিণী।

গানটি ভাল করিয়া গাহিয়া বাবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে অমল-ধবল বিস্ফারিত বক্ষ যেন লোহিতাভ হইয়া উঠিল নয়ন দুইটি দিয়া যেন জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের অজ্ঞেয় নীলদ্যুতি ছুটিয়া বাহির হইল। বাবাজীর যে বড় বড় পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ জটা যেন ফুলিয়া সোজা হইয়া ব্যোমকেশের আকার ধারণ করিল। এমন মূর্ত্তি বিজয় ও দরিয়া কেহই দেখে নাই। তাহারা উভয়ে সভয়ে সে বিরুপাক্ষ ব্যোমকেশ বিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দুই নর কপাল যেন লুটাইয়া পড়িল গুরুর চরণে স্বামী স্ত্রী পড়িয়াই আছে বিভোর বিভ্রান্ত হইয়া যেন পড়িয়াই আছে। দণ্ডেক কাল পরে মাথা তুলিয়া দেখে কোথায় বা বাবাজী কোথায় বা কে,—বাবাজী অন্তর্ধান হইয়াছেন। তাহারা দুই জনে পাগলের মত মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। যখন দেখিল বাবাজী পালাইয়াছেন, তখন উভয়ে কাঁদিতে লাগিল ক্রন্দনের সমবেদনায় দুইজনে দুইজনের গলা জড়াইয়া ধরিল আর কাঁদিতে লাগিল। বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা ঘটে নাই তাহাই ঘটিল। উন্মাদিনী দরিয়া বিমূঢ়া বিহ্বলার ন্যায়, বিজয়ের বুকের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গুরু-বিরহে দুইটি জীবাত্মার সম্মিলন একটি পরমাত্মার স্ফুরণ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বুঝাপড়া।

দরিয়া। গৃহস্থালী ত পাতাইব, তোমাকে লইয়া ত ঘরকন্না করিব; তাহার পূর্ব্বে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। হোসেনখাঁর ব্যাপারটা কি আমায় বল দেখি?

বিজয়। গুরুজীর হুকুম, বাঙ্গালায় এখনও সহজিয়া দলের আকড়াধারী বাবাজীরা মেয়ে মানুষ ভুলাইয়া লইয়া যায়। তাহা গুরুজী জানিতেন, স্বরূপদাসেরও খবর তিনি রাখিতেন, তাই আমার উপর হুকুম, আমি তাই চামড়াওয়ালা হোসেনখাঁ সাজিয়া তোমার বাড়ীর পাশে ছিলাম, হিন্দি উর্দ্দু ভাল জানিতাম না, ধরা পড়িবার ভয়ে কথা কহিতাম না। আসল কথা গুরুজীর ভক্ত এক চামড়াওয়ালার আশ্রয়েই আমি ছিলাম।

দরিয়া। আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে দিলে কেন?

বিজয়। সেও গুরুজীর হুকুম, আর আমারও তাতে একটু চালও ছিল। ভেবেছিলাম, আমি তোমার এত বড় একটা উপকার করিলে তুমি আমার বাধ্য হবে।

দরিয়া। গুরুজী আমাকে আর একটা পোড় খাওয়াইলেন, কেমন? এর মধ্যে বাধ্য বাধকতা কিছু নেই বিজয় এক নদী দিয়ে জোরে বন্যা আসিতেছে, সম্মুখে একটা বাঁধ দিয়া অন্য নদীতে তাহা ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। সুকুমার যুবক আমিও যুবতী, একসঙ্গে অতদিন কলিকাতায় বাস হইল তাই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। ইসারায়

গুরুজী সুকুমারকে বলিলেন, তুমি গঙ্গার গর্ভ দিয়া বহিয়া যাও তোমার আশ্রয় সুকুমারী, আর আমাকে গিরি নদীর মতন সাত টাল খাওয়াইয়া শেষে তোমার কাছে আনিয়া ফেলিলেন। ব্যাপারটা ইহা ছাড়া আর অধিক কিছু কি?

বিজয়। বুঝেছে ঠিক বটে, বাবাজী তোমাকে গামছা নিংড়ানর মত নিংড়াইয়া কেবল স্নিগ্ধতা যুক্ত রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি প্রেমটা কি? এই যে এত মহাজনের পদ গাও ইহার অর্থ কি?

দরিয়া। ইহার অর্থ, পুরুষ প্রকৃতির আকর্ষণ, ইহার অর্থ সৃষ্টি তত্ত্ব—এক আমি বহু হইবার প্রচেষ্টা।

বিজয়। বলিহারি গুরু ঠাকুরুণ বুঝেছ ভাল, এখন এই বোধ লইয়া আদর্শ গৃহস্থ আশ্রম বাঙ্গলায় গিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে বড় কঠিন ঠাঁই, কার্য্যের বহরটা বুঝেছ।

দরিয়া। সে বড় সোজা দেশ গো, সরল কোমল মেদুর মধুর দেশ। সে দেশে যাহা আজ্জাইবে তাহাই গজাইবে, গঙ্গার পলি মাটিতে যাহা গাড়িবে তাহাই হইবে। কাট ছাঁট নাই বাদ ছাদ নাই, গড়িতে জানিলে সমস্ত মাটিটা দিয়াই গড়া চলিবে।

বিজয়। বটে, কিন্তু ইয়োরোপের "লভ" আমদানী করিয়া গুপ্তিপাড়ার গঙ্গার মাটিতে অনেক গুপ্ত বানর বানরী যে গড়া হইয়াছে। এখন যে বাঙ্গালায় কামের সন্ধিক্ষণ ছাড়া আর কিছু নাই, রীরংসা ছাড়া আর কিছু বিকায় না।

দরিয়া। বেশত একটা কিছু হয়েছে ত আমি তাদের বলব—

রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি বসি গীতি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা—সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥

আমি এই তত্ত্ব গান করিব আর তুমি মায়ের নাম শুনাইবে। আর সহজ ধর্ম্মের সোজা কটা কথা তাহাদিগকে বলিব। বানর বানরী হইলে কি হয় পোড় ত খায় নাই। একটু অভাবের তাপে বিলাসের রৌদ্রে শুখাইয়াছে মাত্র। ভক্তির জল খানিকটে ঢাললে যে মাটি সেই মাটিই হইবে। কথাটা কি জান, যারা পূর্ব্বে আসল কথা শুনাইত তাহারা আর নাই, সে কলেজাওয়ালা গায়ক নাই, সে ভাবুক কীর্ত্তনীয়া নাই, সে তত্ত্বজ্ঞ ব্যাখ্যাতা নাই। পঞ্চাশ বৎসরের ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার অনাবৃষ্টিতে সব শুখাইয়া গিয়াছে। আমি যদি আবার তেমনি করিয়া শুনাইতে পারি, তুমি যদি আবার তেমনি করিয়া বলিতে ও গাহিতে পার তাহা হইলে বাঙ্গালী শুনিবেই। একথাটা বাবাজী আমায় একদিন বলেছিলেন। তাই বাঙ্গালার উপর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বড় দৃষ্টি পড়িয়াছে। চল যাইত,—গুরু সহায় ভাবনা কি?

বিজয়। আমাকেও তিনি ঐ কথাটা বলেছিলেন, দেখছি আমাদের দুটোকেই এক ছাঁচে ঢেলে পিটেপুটে ছেড়ে দিয়েছেন। একটা হাসির কথা মনে হ'ল, হোসেনখাঁকে তুমি মিশরের লোক বলে মনে করেছিলে কেন?

দরিয়া। তুমি যে অতটা ভোল বদলাতে পার তা ত আমি ভাবি নি। আর তুমি যে আসবে তাও প্রত্যাশা করি নি। তারপর তোমার চেহারাটা অনেকটা কায়রোর একপাশার মত হয়েছিল। সে আমাকে বাঁদী বানাতে চেয়েছিল, সেনুমী দেয় নাই। তওকিম্ পাশার শাসন ভয়ে সেও জবরদস্তি করে নাই। আমার তাই শঙ্কা হয়েছিল বুঝি সেই মিন্‌সে কল্‌কাতায় এসে গুণগান করে আমায় আবার চুরী করে না নিয়ে যায়। মিন্‌সেগুলো সাক্ মর্কট কি না; ডারউইন ত মিথ্যা কথা বলে নাই, বিশেষতঃ মনের মত মেয়ে মানুষ দেখলে তারা একেবারে এলিয়ে পড়ে।

বিজয়। তা বটে। ডারউইনের তত্ত্বটা ঐ দিক দিয়ে দেখলে নিতান্ত মিথ্যা বলে মনে হয় না। তা যা হবার তাত হয়ে গিয়েছে, এখন চল কলিকাতায় যাই। বাবাজী যা পুঁজী দিয়ে গিয়েছেন তাতে ত কলিকাতার ছয় মাসের খরচ কুলিয়ে যাবে। এরা অত টাকাই বা পায় কোথা থেকে?

দরিয়া। আমি মেয়ে মানুষ, ডারউইনের থিয়োরী মানি নে। বলি কলিকাতায় ত আড্ডা গাড়তে যাচ্ছ, হাবসীর কথাটা ভেবেছ? দেবী অপরাজিতা কি সেই পাহাড়ে দেশেই থাকবেন?

বিজয়। কেন সেত বলেই দিয়েছে, তোমার কোলে ছেলে হলে সে এসে মানুষ কর্ব্বে।

দরিয়া। দেখ ঐ কথাটাতে আমার মনে কেমন একটু ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। আমার কাণে কাণে কে যেন বলে দিচ্ছে, আমি ছেলের মা হওয়ার পরই, আমাকে মর্ত্তে হবে, আর তিনি এসে তাঁর বেদখল সম্পত্তি দখল করে বসবেন।

বিজয়। দূর খেপী! একচেটে করবার প্রবৃত্তিটা তোমাদের মন থেকে

গেল না। তারপর আমার সাধের বৌ—আমাদের হাবসী, সত্যই এখন দেবী অপরাজিতা। দেখেত এসেছ। সে কি মানবী, তার উপর অত রীষ কেন।

দরিয়া বিজয়ের মুখে একটা ঠোনা মারিয়া মুখ চোখ ঘুরাইয়া উঠিয়া গেল এবং বলিল, যাই বাঁধাছাঁদা করিগে। এখানকার সকলের কাছে বিদায় নিতে ত হবে। বিজয়ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন এবং উভয়ে গাঁঠরী বাঁধিবার কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমাজে।

কলিকাতার উত্তরাংশে একখানি বেশ নূতন বাড়ীতে ভাড়াটিয়া রূপে বিজয় ও দরিয়া আসিয়া বাস করিতেছেন। বিজয় এক বড় নূতন সওদাগরের মুৎসুদ্দি হইয়াছেন, গাড়ী জুড়ি অনেক আশ্রিত লোকজনও অনেক অর্থ উপার্জ্জনও হইতেছে বেশ। ধনবলে ও জনবলে, বিজয় কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত হইয়া আছেন। অনেক বড় বড় লোক তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সভ্য সমাজের অনেকে সস্ত্রীক আসিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন। বিজয় কলিকাতার একজন বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাহার উপর দরিয়া সুগায়িকা, সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং সর্ব্ব কর্ম্মে পটীয়সী কাজেই তিনিও সমাজে প্রতিষ্ঠা সম্পন্না হইয়াছেন। কিন্তু দরিয়া সে দরিয়া

আর নাই শরতের গঙ্গার ন্যায় কোনখানে শীর্ণা ক্বচিৎ বা বিস্তীর্ণা হইয়া আছে। দরিয়া অন্তর্বত্নী। একদিন দ্বিপ্রহরে বিজয় আফিসে যান নাই দরিয়ার কাছেই বসিয়া আছেন কারণ দরিয়ার সে শঙ্কা ত দূর হয় নাই, তাই অন্য কাজের সঙ্গে দরিয়াকে আশ্বস্ত করা বিজয়ের একটা বড় কাজ হইয়াছিল। দরিয়ার শরীর বড় অসুস্থ বোধ হওয়াতে বিজয় বাড়ীতেই ছিলেন। দরিয়া কতক্ষণ পরে হাই তুলিয়া বলিলেন, আমি একটু সুস্থ বোধ কচ্ছি, তোমাকে না জানিয়ে আমি একটি কাজ করেছি। শুনিলাম দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে তাই দিদিকে একখানি তার করেছি।

বিজয়। যা করেছ বেশ করেছ। কিন্তু তোমার ও ভয়টা গেল না কেন?

দরিয়া। কেন যে গেল না তা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। এখন আবার মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখি।

বিজয়। যাক্ সে কথা বাঙ্গলা দেশটা বুঝছ কেমন? কলিকাতার সমাজ দেখছ কেমন।

দরিয়া। দেখছি মিষ্টতার আবরণে অনেক গলদ ঢাকা আছে। সবাই সব জিনিষেই হাঁ বলে কিন্তু কাজের বেলায় কেউ এগোয় না। সবাই সব হতে চায়, হতে গেলে যে কাজ কর্ত্তে হয়, তা কেউ ভাবে না, তারপর ভদ্রতার আবরণে অনেক মর্কটামি ঢাকা আছে। তোমায় বলি নাই আমি অনেকগুলোকে সত্যই বানর বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, ছিলই বানর আর বানাব কি? কেবল নাচিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

বিজয়। বেশ করেছ আমিও আমার তরফ থেকে অনেক গুলকে

নাচিয়েছি এবং নাচাচ্ছি। তবে আমার রূপ অপেক্ষা দৌলতের আকর্ষণেই অনেকে নাচ্ছে। এ সহরে টাকাটাই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট,—তাই বাবাজী আমাদের টাকার গাদার উপর বসিয়ে রেখে দিয়েছেন।

দরিয়া। দেখ, আমরা যাদের সঙ্গে চলা ফেরা করি তারা জানা পুকুরের পানামাত্র, তার নিচে খাসা জল আছে বাঙ্গালার নীচের স্তর গুল নিতান্ত মন্দ নয়।

বিজয়। তা ঠিক। তার উপর সন্ন্যাসীদের কাজগুল দেখছ ত? কেমন বেমালুম নিশব্দে চারিদিকে কাজ চলছে। এ কাজের গতি ও প্রকৃতি বাঙ্গলার বাবুর দল ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিতেছে না। অনেক জায়গায় যে আমাদের টাকায় অনেক কাজ হচ্ছে তাও কেউ জানে না। এরা কি চোখ চেয়ে চলে না।

দরিয়া। নাঃ সে সামর্থ কারও নাই। প্রত্যেকেই নিজের দেহটাকে কেন্দ্র করিয়া নিজের ভাবনায় রত আছে। আসে পাশে যে কি কাজ চলছে তা কেউ দেখ্ছে না। এক একবার মনে হয় যে চোখটা ফুটিয়ে দিই।

বিজয়। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। যখন কাল পূর্ণ হবে তখন অনেকেরই চোখ ফুটবে। এখন কিছুতে কিছু হবে না।

দরিয়া। তা বটে। অত বড় একটা হাইকোর্টের উকিল, এত অর্থ সম্পত্তি ঐশর্য্য ছেড়ে ফকিরী নিয়ে চলে গেল, কেউ সেটা লক্ষ করলে না। গোঁসাই বিজয়কৃষ্ণ কার প্রেরণায় অমন করে সব উলটে দিলে, চির জীবনের মেহন্নতের ফল একেবারে মুছে ফেল্লে, তা কেউ তলিয়েও বুঝলে না। কেশবচন্দ্রের, বঙ্কিমচন্দ্রের নবীনচন্দ্রের ভিতর দিয়ে যে কত

কাজ হচ্ছে, তারও বিশ্লেষণ কেউ কল্লে না। বিবেকানন্দ কি বার্ত্তা শুনিয়ে গেল তাও এখন ঠিক মত কেউ বোঝে নাই। তারপর এই যে সন্ন্যাসীর দল যাকে পাচ্ছে তারই কাণ ধরে মন্ত্র দিচ্ছে এর ভিতরেও যে একটা মতলব আছে তাও কেউ ভাবছে না। বাঙ্গালীকে যে ভেঙ্গে গড়া হচ্ছে। আমরা উপরে টোপা পানা ভাসছি মাত্র। যাক শরীরটে কেমন কচ্ছে শুই একটু।

অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছে, পশ্চিমের একখানা ডাকগাড়ি আসিয়াছে, সেই গাড়ি হইতে একটি সজীব সরল ভৈরবী মূর্ত্তি নামিলেন। সঙ্গে একজন সন্ন্যাসী—বাল যোগী ; উভয়ে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিজয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয় সে খবর জানিতেন ষ্টেসন লোকও পাঠাইয়া ছিলেন সেও ঐ সঙ্গে আসিল। দেবী অপরাজিতা, অনেক দিন পরে এবার ভৈরবী বেশে প্রবেশ করিল। হাবসীকে দেখিয়া দরিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, কষ্টে শ্রেষ্টে একটা প্রণাম করিল। হাবসী নির্নিমেষ নয়নে আগাগোড়া দরিয়াকে দেখিলেন, দেখিয়া কিছু না বলিয়া কাছে বসিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দিদি এসেছ বেশ করেছ। আমার এবার সব ভয় ভাবনা দূর হ'ল। মরি তাতে আর দুঃখ নেই।"

অপরাজিতা। মরবে কেন বোন্? আমিই বা কেন এত দূর থেকে ছুটে এলাম। আমরা ত কেউ মরবার জন্য আসি নাই, কাজ কর্ত্তে এসেছি।

দরিয়া। যাক আর ওসব কথায় কাজ নেই। তোমার সঙ্গে কে এসেছে?

অপরাজিতা। আমার ছেলে সেই বিমলানন্দ। তার কলিকাতা দেখবার বড় সখ হয়েছে। কলিকাতায় আসবে বলে তিন মাসের মধ্যে ইংরেজি শিখে বসে আছে। বলে ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা, একটু ইংরেজি ভাষা না শিখলে কি চলে। সে নীচেই আছে। কলিকাতা দেখে, সে সাগরের মেলায় যাবে, সেখান থেকে জগন্নাথ দেখতে যাবে। তারপর ফিরে এসে কামরূপ যাবে। পূর্ব্বাঞ্চলের তীর্থ গুলিত সে এইবার দেখে যাবে।

এই সকল কথোপকথনের পর সকলেই উঠিয়া গেলেন, অপরাজিতা স্নানাদি করিলেন এবং একান্তে বিজয়কে বলিলেন, যে একজন ভাল ধাত্রী আনিয়া রাখ। বড় বেশী বিলম্ব নাই পাঁচ সাত দশ দিনের মধ্যেই পুত্র প্রসব হইবে।

বিজয়। তুমি এত শিখলে কোথা থেকে ?

অপরাজিতা। পাহাড়ে আমিই যে চার্লস সাহেব হয়েছিলাম। পাহাড়ীদের বাড়ীতে প্রসব বেদনা হইলেই আমায় ডাকিয়া লইয়া যাইত। দরিয়ার পেটে খুব বড় ছেলে আছে, দরিয়ার শঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। আমাদের উভয়কেই সাবধানে থাকিতে হইবে। ভাল ধাত্রী একজন নিযুক্ত করিয়া বাড়ীতেই রাখিয়া দাও। ডাকের মাথায় যেন একজন ভাল ডাক্তারও থাকে।

বিজয় ভীত নয়নে শুষ্ক মুখে সকল কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন হাবসী উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শুভাগমন।

দরিয়া। দিদি সত্যই এ বড় দুঃখে সুখ। গর্ভবেদনার ন্যায় বেদনা নাই, আবার গর্ভ বেদনার ন্যায় সুখও নাই। এ এক আজব ব্যাপার, যাহা ছিল না তাহা হইতেছে, একটা নূতন কিছু হইতেছে বলিয়াই কত রকম নূতন ভাব ফুটিতেছে। আমি সত্যই কেমন যেন কি হয়ে গিয়েছি।

অপরাজিতা। সংসারের এই ত মজা, এইটে থেকেই ত সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা যায়। ঐ থেকেই ত ভগবানের অস্তিত্ব বোঝা যায়। বিশ্ব সৃষ্টি ত দেখি নাই নর সৃষ্টি দেখিতেছি, তাই ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির ভাব অনুভব করি। এই বোঝ আমার হল না তোর হল কেন? আমাদের শাস্ত্র বল, পুরাণ বল, পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্ব বল সবই এই গর্ভ সৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি যে ভাবে এই তত্ত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সেই ভাবে ইহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন।

দরিয়া। যন্ত্রণা ত কম পাইতেছি না, অসাধারণ ও অসহ্য যন্ত্রণা জীবনে কষ্ট ত অনেক রকমের পাইয়াছি---মিশরের মরুভূমি হইতে মহাকালের মন্দির ও ব্রহ্মপুত্রের চড়া পর্য্যন্ত—সকল অবস্থায় সকল রকমের কষ্ট পাইয়াছি কিন্তু ইহার তুলনায় সে সবই অতি সামান্য, এত অসহ্য কষ্ট সহ্য হয়ে যাচ্ছে। কে যেন সইয়ে দিচ্ছে। ঢেউএর মত এক একটা বেদনা আসছে, পেটের বত্রিশ নাড়িকে মোচড়াইয়া তুলিতেছে অথচ আমি মা হব বলে সব সয়ে যাচ্ছে।

অপরাজিতা। ভাগ্যবতী তুমি, নারী জন্মের সার, মনুষ্য জন্মের সর্ব্বস্ব তোমার করতলগত হইতেছে। বড় দুঃখ হ'লেও এ যে বড় সুখ। ভয়

পাইও না, চিন্তা করিও না, যিনি এমন অঘটন ঘটাইয়া থাকেন তিনি আমাদের দেহে বল দেন, সহ্য শক্তি দেন আর আমরা মা হই। এইখানেইত তন্ত্রে এবং বৈষ্ণব মতে পার্থক্য। তন্ত্র বলেন জননী হইবার জন্যই নারী রমণী হইয়া থাকে অতএব মাতৃত্ব নারী জন্মের পরমাবসাণ বা সার। আর সহজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঐ মাতৃত্বটুকু বাদ দিয়া কেবল রমণীয়তাটুকু গ্রহণ করে।

সূতিকাগারে বসিয়া দরিয়া ও অপরাজিতা কত কথাই কহিলেন, কত গল্পই করিলেন, যখনই বেদনার বেগ হয় অসহ্য যাতনা হয় তখনই অপরাজিতা স্তব স্তোত্র পড়েন, গান করেন দরিয়াকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। সারা নিশা এই গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রথম প্রভাতে বালারুণের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দরিয়া একটি নবকুমার প্রসব করিল। সূতিকাগার আলো করিয়া ছেলে মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিজয়ের আনন্দের সীমা নাই, তিনি সময়োচিত দান ধ্যান উৎসব ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল করিলেন, বিমলানন্দ তাহাদের সহায়, সে কোথা থেকে সন্ন্যাসী ডাকিয়া আনে, পণ্ডিত ডাকিয়া আনে, কত স্তব স্তোত্র পাঠ করায় আর টাকা দিয়া কাপড় দিয়া বিদায় করে। বিজয় হাজার একটাকা দিয়া সদ্য প্রসূত পুত্রমুখ দর্শণ করিল, ধাত্রী এত টাকা কখনও পায় নাই সে আনন্দে আটখানা হইয়া গেল।

দরিয়া পুত্র প্রসব করিল বটে কিন্তু নিজে যেন কাবু হইয়া পড়িল। তবে সুচিকিৎসার গুণে অপরাজিতার সেবার প্রভাবে সামলাইয়া উঠিল। প্রথম তালটা সামলাইল। যেটেরা ছড়ার দিন বাড়ীতে খুব ধুমধাম আমোদ আহ্লাদ চলিতেছে, দরিয়া অপরাজিতার মুখপানে চাহিয়া বলিল—

দিদি একটা কথা আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, তুমিই প্রথমা প্রধানা স্ত্রী, তুমিই প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মপত্নী তোমার কোন ক্রটিও হয় নাই, কোনও

দরিয়া

রোগ নাই, বাধা নাই, দেহ নির্ম্মল নিরুপম, তুমি ছেলের মা হইলে না আর আমি স্রোতের কুটার মত ভেসে এলাম, অজ্ঞাত কুলশীল আমি। বিবাহ হইল শৈব মতে আর আমারই গর্ভে পুত্র হইল। ইহার মধ্যে ঠাকুরদের একটু চাতুরালী নাই কি? তুমি যেন জান বলিয়া আমার একথাটা মনে হচ্ছে।

অপরাজিতা। জানি, কিন্তু তোকে এখন বলব না। ও সব কথা শোনবার এ অবস্থা নয়।

দরিয়া। আমি কাল রাত্রে একটা স্বপন দেখেছি। গুরুজী যেন আমার কাছে এসে বসেছেন এবং আমায় বলছেন, আমি এসেছি মা তোরই পেটে এসেছি, কিন্তু আমি বড়মার কোলে মানুষ হব। সেই অবধি আমার মনে ভাবনা হ'য়েছে যদি তাই হয় তাহ'লে ত আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে মানুষ আমি ছেলে মানুষ কর্ত্তে পারবো কেমন করে। তার উপর বামুনের ছেলে গড়ে তোলা। তাই ভাবছি কাজ কি আর বোঝা বয়ে, তোমার কর্ম্ম তুমি কর আমি খোলস ছেড়ে পালাই।

অপরাজিতা। দাঁড়া! আগে শুদ্ধ হয়ে উঠ তারপর যা হয় করিস্। মরণটা যেন ওর হাতের মধ্যে!

দরিয়া। তবে কি ষষ্টিপূজার আগে আমায় কিছু বলবে না!

এমন সময় বিজয় আসিয়া সুতিকাগারের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, ওগো সেনুমী এসেছেন, তিনি ধূলো পায়েই ছেলে দেখবেন, ঘরে আনব কি? অপরাজিতা যেন একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, নিশ্চয়। বলিতে না বলিতে সেনুমী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিনা জিজ্ঞাসায় কক্ষদ্বার নিজে

ঠেলিয়া খুলিয়া ভিতরে যাইলেন এবং দ্বারের সম্মুখেই থপ করিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় বলিলেন, দেখা তোর ছেলে আমার কোলে দে। আমার নাতী ত বটে, আজ একবার ভাল করে দেখি। ধাত্রী তাঁহার ক্রোড়ের উপর শিশুকে শুয়াইয়া দিল এবং ধীরে ধীরে কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া স্বয়ং বাহিরে গেল। এমন মানুষ সেত কখনও দেখে নাই। সে ঘরের বাহিরে গিয়া বিজয়কে বলিল, চল আমরা সরে যাই স্বয়ং বিধাতা পুরুষ ছেলের মাথায় কি লিখে দেবার জন্য এসেছেন। বিজয় কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং সরিয়া গেলেন।

দরিয়া সবিস্ময়ে সেন্নুমীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, একি রূপ তোমার এ যে সেন্নুমী ও বাবাজী দুজনে মিলে এক চেহারা করেছ।

সেন্নুমী। দূর খেপী! তোর বাবাজী যে মণিপুরের শ্মশানে দেহত্যাগ করেছেন। আমি তোর সেই মিশরীবাবা।

দরিয়া। এইবার বল দেখি আমি কে আর তুমিই বা কে?

সেন্নুমী। তুমি কে তার একটু পরিচয় আজ দিব বলিয়াই আসিয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ দম্পতীর কন্যা। আমি তোমাকে ছয় মাসের মেয়েটি কুড়াইয়া পাইয়া ছিলাম, তোমার গর্ভধারিনী যখন দেহত্যাগ করেন তখন তিনি বলেন এই মেয়ে যদি বাঁচে আর তার পেটে যদি ছেলে হয় তাহা হইলে ছয়দিনের দিন সেই ছেলেকে এই তাবিজ বা মাদুলী এই মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া এস। ইহাতেই আমাদের পরিচয় আছে। আর ইহাই আমার দৌহিত্র বংশকে রক্ষা করিবে। এই বলিয়া সেন্নুমী নিজের ঝুলীর ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব হাঁসুলী ও মুক্তার মালা বাহির করিলেন। তেমন চুনী পান্না খচিত অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র হাঁসুলী দরিয়া

কখনও দেখে নাই, তেমন মুক্তার মালাও, সর্ব্বদা কেহ দেখিতে পায় না। ছেলেকে তাহা পরাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঝুলী হইতে দুইটা লোহার কড়া নবজাতকের দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে ও বামপদে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, কালে ইহা হইতেই তুমি তোমার আত্ম-পরিচয় পাইবে। আর আমার পরিচয় তাও ক্রমে জানিবে।

দরিয়া। আমি আর ক'দিন টেঁকবো, আমার যেন মনে হচ্ছে আমার যাবার দিন নিকটে আসছে কাজেই ঐ কথাটা জানতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।

সেমুমী। বলেও ছিলাম তুমি গুজরাটের ব্রাহ্মণ কন্যা তোমার পিতার নাম জানি না বোধ হয় এই হাঁসুলী হইতেই প্রকট হইবে।

দরিয়া। আচ্ছা বাবাজীর মুখের ভাবটা তোমার মুখে আজ দেখতে পাচ্ছি কেন?

সেমুমী। তিনিও এসেছেন—আতিবাহিক দেহে এসেছেন, আমার নয়নে নয়ন মিলাইয়া পুত্র দর্শন করিতেছেন এই বলিয়া সেমুমী নবজাতকে মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া আবার বলিলেন। কি বন্ধু খুব শীঘ্রই কাজ সেরে ফিরে এলে বটে! নূতন দুনিয়ার নূতন কাজ কর আমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখি।

দরিয়া। তবে কি বাবা গুরুজীই এসেছেন নাকি?

সেমুমী। ওকথা বলতে নেই, নবজাতকের অকল্যান হয়।

দরিয়া। আমি যে স্বপন দেখেছি।

সেমুসী। তবেই হয়েছে! তা এক বছর তুমি থাকবে, কি বল অপরাজিতা, তারপর ত তুমি সামলাতে পারবে শুন দরিয়া, গোটা দুই তিন নূতন মানুষ গড়বার প্রয়োজন হয়েছে পাহাড়ে অনেকগুল মানুষ ভয়ের হচ্ছে, এদেশেও গোটা কতক মানুষ তৈয়ার কর্ত্তে হবে। নন্দ একটি আর তোমার

সদানন্দ দ্বিতীয়টি, তাই যে আধারে ও যে ঔরসে যে ক্ষেত্রে ও যে বীজে এমন মানুষ গড়া যেতে পারে তেমন ক্ষেত্র আধার হাতে তুলে আমরা দুটি ফল পাইয়াছি, গোড়া হইতে না গড়িলে মানুষ হইবে না। পাকা ইস্পাত তৈয়ার হইবে না। তোমার ক্ষেত্র ঠিক হইয়াছিল তাই এই অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এখন সে সকল ভাবনার প্রয়োজন নাই। সাবধান সংযত ভাবে হৃদয়ের ক্ষীর নীর ধারা দিয়া এ শিশুকে পোষণ কর। একটা কথা বলিয়া যাই আমি খাঁটি মিশরের মানুষ নই, আমিও ভারতবর্ষের, তোমার বাবাজী যাহা ছিলেন, আমিও সেই দলের, কেবল ভঙ্গি বদল করিয়াছি। কতকটা সুফীর দলেও আছি, ওয়াহাবীদের সঙ্গেও মিশিয়াছি, নিঙ্গায়েৎদের দলেও থাকি। শিক্ষার জন্যই আমার মিশরে বাস, আসলে আমি রাজপুতানার মানুষ। তোমাকেও একবার বলিয়া ছিলাম আমরা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সবই এক, এক কেন্দ্রে সকলেরই ঝুটি বাঁধা। আম্মেনীয়ার এবং ক্রীটের খৃষ্টান হার্মিট বল, সেনুষী বল, সুফী বল, ওহাবী বল, আর আমাদের ভারতবর্ষের, তিব্বতের ও চীনের অসংখ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই বল আমরা সবই এক। তবে দেশভেদে জাতীভেদে আমাদের আকার প্রকার ও কর্ম্মভেদ ঘটে। তুমি একজন বড় ব্রাহ্মণকে পেটে ধরেছ মা, একজন একান্ত সিদ্ধ সাধক এসেছেন, কি লীলা করবেন তিনিই জানেন। আমার চিন্তা নাই দেবী অপরাজিতা ধাত্রীর কাজ করিবেন, তিনিই ইহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবেন। আরও কুড়ি বচ্ছর বেঁচে থাকতে হবে অপরাজিতে, একে যুবক করে ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে, সেত বেশীদিন নয় মা। প্রায় হাজার বছরের বুড়োকেও তুমি ত' দেখছ, দেখেছ।

এই বলিয়া সেনুষী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আট মাস পরে

আবার আসিব তখন অন্ন প্রাসনের আয়োজন করিও, ইহার জাতকর্ম্মগুলি সন্ন্যাসীর হিসাব মত করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

দরিয়ার বেশ ছেলে হইয়াছে। এত বড় ছেলে, ছেলে কোলে করিলে হাত ভারিয়া যায়, মোটা সোটা নীরোগ সবল ছেলে, বড় বড় চোখ, বড় বড় নাক কান, সকলেরই কোলে যায়, সকলেরই সহিত আব্দার কাড়ায়, আর হাবসীর কোলে থাকিয়া কেবল উৎপাত উপদ্রব করে। ইদানীং দুই তিন মাস হইতে দরিয়া যেন একটু আনমনা হইয়াছে, ছেলেকে যেন তত নেয় না, তেমন আদর সোহাগও করে না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরও করে না। অপরাজিতাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আরে ও পাগল। ছেলে বিইয়ে দিয়েছে এই যথেষ্ট।

বাস্তবিকই দরিয়া যেন একটু পাগলের মতই হইয়াছিল, বিজয়ের সঙ্গেও তেমন মন খুলিয়া কথা কহিত না, আর অত সখের নাচ গান তাও কিছু করিত না। বিজয় অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে দরিয়া উত্তর করে নাই। একদিন সহসা দরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ গা ছেলের ভাত দেবে কবে? বিজয় একটু হাসি হাসিয়া বলিল, স্বামীজি দিন করে পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন বোধ হয় আগামী মাসেই হবে। দরিয়া যেন একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, আজ থেকে কত দিন পরে হবে সেইটে বল না। বিজয় একটু রুক্ষভাবে বলিল, "আর তিন সপ্তাহ পরে, কেন তোমার এত চাড় কেন?"

দরিয়া। সেই পর্য্যন্ত আমার মেয়াদ কিনা, তাই আর ক'দিন বাকি আছে জানতে চাহিতেছিলাম। ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়া না যাইতে পারিলে নাকি ছেলের মা ঠিক মত হওয়া যায় না ?

বিজয়। আচ্ছা পাগল ! রোগ নেই জ্বালা নেই বলে কি না মরব।

দরিয়া। রোগ জ্বালা হতে কতক্ষণ ? এক একটা কাজ কর্ত্তে এক একটা মানুষ পৃথিবীতে আসে, সে কাজ শেষ হলে আর থাকবার প্রয়োজন থাকে না। আমার কাজ ত হয়েছে। তুমি খোকাকে কোলে পাইয়াছ, আর আমার বাকিটুকু সেই ত গায়িকা নর্ত্তকী তার প্রয়োজন ত. এখন আর নাই। যখন ছিল, তখন সহচরী, জগতমোহিনী বামাসুন্দরী প্রভৃতি বড় বড় গায়িকা ছিল। এখন তাহার প্রয়োজন নাই তাই আর তেমন জন্মায়ও না। এই কলিকাতায় এতদিন থাকলাম কটা লোকে,—কয় জন বাবু আমার গান শুনিলেন। আর ঐত বিন্দু আছে কেই বা তার গান শুনতে দামুদরের শ্মশানে, মশানে ঘুরে বেড়ায়। আমাতে যাহা ফুটিয়াছে সমাজে এখন তাহার প্রয়োজন নাই, কাজেই আমার কাজ শেষ হইয়াছে। দিদির কাজ বাকি আছে। দিদি যাহা শিখিয়াছেন তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে। অতএব,—চল ভার লয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হয়েছে।

বিজয়। নিতান্তই চললে ! ডাক্তার ডাকবো নাকি ?

দারিয়া। ডাক্তার ডাকতে হবে না, আপনিই আসবে, না মরিলে এ রোগ যাবে না, আমি না মরিলে তোমাতেও আর একটা জিনিস গজাইবে না, তুমি বেজায় বিষয়ী হইয়া উঠিতেছ। তান্ত্রিকের শিষ্য তুমি কেবল নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কাজ করা ছাড়া আর কি কচ্ছ বল দেখি।

বিজয়। আর ত কিছু নাই। এখন খোকাই সংসারের সার হইয়াছে !

উহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে। আচ্ছা দেখা যাক তুমি কেমন মর।

দরিয়া একটু হাসিল এবং সেই পুরাতন ভঙ্গী লাগাইয়া, সেই বিলোল কুটিল কটাক্ষ ঘুরাইয়া দুই নয়নে শত সজলের নর্ত্তনে মাথুরের গান ধরিল—

সখীরে ঐ সে মাধবী আমার মাধব লুকায়ে ছিল।

দেখ আমি বৈষ্ণবী ছাড়া তান্ত্রিক হইতে পারি নাই। মা হইবার জন্যই মাতৃত্ব অবলম্বন করিয়া ছিলাম, সে কাজ ফুরাইয়াছে, আবার যেন ফোয়ারার জলের মতন হৃদয় সকল স্তর ভেদ করিয়া রসতত্ত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাও আমার মরণের একটা পূর্ব্বাভাস।

দরিয়া আবার চোক মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—যাব।

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

—দেবার যে লোক নাই, এ ত্রিলোকে আমার মত আদর কর্ব্বার আর যে মানুষ নাই, দুই গণ্ড বহিয়া দরিয়ার বুক ভাসাইয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল, একে একে চণ্ডীদাসের গুরু বিরহের সকল পদগুলিই দরিয়া গাহিল, অপরাজিতা খোকাকে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বিজয় স্থাণুর ন্যায় সে গান শুনিতেছিল সেও নড়িল না বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিল না। অনেকক্ষণ পরে দরিয়া বলিল আজ একটা গান মনে পড়েছে, স্বরূপদাস বাবাজীর আকড়ায় এ গানটা শুনেছিলাম, এই বলিয়া মধুকানের, "বোল তারে কারাগারে আর কতদিন রইতে হবে" এই গানটি সুন্দর করিয়া গাহিল। বিজয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। নিজের কক্ষে যাইয়া বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল,—

"এ কি এ? জীবনটা কি কেবলই দগ্ধাগ্নিতেই কাটিবে?" দরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল পিছন হইতে বলিল,—জীবনটা কি কেবল তোমার দেহের জন্যই। দিদি কি চিরজীবনটা সধবা হয়ে একাদশী করবে? জীবন জীবনেরই জন্য, জীবন পরের জন্য নিজের জন্য নহে, একথা আমি বলছি মনে করিও না তোমার গুরু বাক্য আমি উচ্চারণ করিতেছি।

প্রায় পক্ষকাল এই ভাবেই কাটিল, দরিয়া সঙ্গীতময়ী হইয়াছিল, কেবল গান করিত এবং গান শুনাইত, সেই পুরাতন স্ফূর্ত্তি, সেই নাচ ও গান পনের দিন অষ্ট প্রহর চলিতেছিল! সহসা একদিন সকালে দরিয়ার কণ্ঠ স্বর আর কেহ শুনিল না তাড়াতাড়ি অপরাজিতা তাহার কক্ষে যাইয়া দেখে খোকা নিদ্রা যাইতেছে আর দরিয়াও অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া শুইয়া আছে। তাহার যূথিকা স্তবকের মত রূপ যেন শুথাইয়া মুষড়াইয়া গিয়াছে। অপরাজিতা আস্তে আস্তে গিয়া দরিয়ার কপালে হাত দিল— উঃ খুব জ্বর! স্পর্শমাত্রেই দরিয়া চোখ চাহিল এবং ম্লানমুখে বলিল, দিদি চলিলাম। অবশ্য ডাক্তার কবিরাজ আসিল নিয়মিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল কিছুতেই রোগের উপশম ঘটিল না। একদিন কমে ত দ্বিতীয় দিন বাড়ে।

বেলা দ্বিপ্রহর, কলিকাতার রাজপথে রৌদ্রের তাপও খুব এমন সময় সেনুমা একটি নারী সঙ্গে বিজয়ের বাটীতে প্রবেশে করিলেন। বিজয় উভয়কে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। প্রত্যুতগমন করা ত দূরের কথা। আগন্তুক উভয়ে কোনও কথা না বলিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং সোজা দ্বিতলের কক্ষে দরিয়ার নিকট যাইয়া বসিলেন। দরিয়া তখন অনেকটা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহ পাংশুময় হইয়া পড়িয়াছে, কষ্টে কথা কহিতে পারে। উভয়ে আসিতেই দরিয়া বলিল, এসেছ?

সেনুমী। তোমার মা।

দরিয়া চমকিয়া বলিল,—"সে কি আমার মা? আমার আবার মা আছেন না কি?"

সেনুমী। আছেন বৈ কি। এ সংসারে কিছু কি নষ্ট হয়।

দরিয়া। তবে আমি যাচ্ছি কেন?

সেনুমী। নূতন হইয়া আসিবে বলিয়া।

দরিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। সেনুমীর সঙ্গে যে নারী ছিলেন তিনি কথা কহিলেন। কথা কহিবার পূর্ব্বে দরিয়ার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দুইবার হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা বিধাতার বিধান তুমি করিবে কি! তাঁহার লীলাবশেই আমারা দেশ ছাড়িয়া অতি দূর দেশে গিয়াছিলাম প্রত্যাবর্ত্তনকালে জাহাজ ডুবি হয় তোমাকে বুকে করিয়া আমি আসিয়াছিলাম, তোমার জনক যিনি তিনি তলাইয়া গেলেন, ইঁহারই কৃপায় আমরা মায়ে ঝিয়ে কুল পাই। ইনি আমাদের চিনিতেন। জ্ঞাতি বিরোধ জন্য আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় শেষে দেশত্যাগীও হইতে হয়, ইনিও সেই বিরোধ জন্য বহু পূর্ব্বেই দেশত্যাগ করিয়াছিলেন ও সেনুমীদলে মিশিয়াছিলেন। তুমি দুই বৎসরের কি করিয়া আমি মিশর ছাড়িয়া চলিয়া আসি, শ্বশুরের ভিটায় ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য না বলিয়াই চলিয়া আসি। আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহা আর বলিব না। আমি সেই অবধি সন্ন্যাসিনী। আজ বলিতে আসিয়াছি তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা মুসলমানী নহ। কাটিয়াবাড়ের বড় ঘরের মেয়ে। আমরা যখন নিশ্চিহ্ন হইয়াই মুছিয়া গেলাম তখন কাজ কি সে পরিচয়ে কেবল পরিচয় দিয়া রাখিলাম এই জন্য এক বংশধর হইয়াছে তোমার কোলে পুত্র দেখিলাম,

সে যদি কখনও বড় হইয়া গয়ায় যায় যেন মাতামহকুলের সকলকে জলপিণ্ড দিতে ভুল না করে। সে সকল পরিচয় নাম ঠিকানা ইতিহাস আমি লিখিয়া আনিয়াছি বিজয়কে দিয়া যাইব। কাল পূর্ণ হইলে এই খোকা হইতেই মাতামহ কুল উদ্ধার পাইবে।

কি জানি কিসের জোর পাইয়া দরিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া বসিল, চীৎকার করিয়া দিদি বলিয়া ডাকিল, অপরাজিতা তাড়াতাড়ি আসিলেন, দরিয়া বলিল, খোকাকে তুলিয়া আগে মায়ের কোলে দাও তাহার পর আমার কোলে দিও। অপরাজিতা তাহাই করিলেন; নবাগতা ছেলের মুখ দেখিয়াই বলিল, হাঁ মাতামহ কুলের অনুরূপই ইহার আকার হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করি তেমনি প্রকৃতি হউক। তোমার আর অধিক দিন নাই মা, তুমি কুলের কাজ করিয়াছ বংশের ধারা বজায় রাখিয়াছ আশীর্ব্বাদ করি এবার আসিয়া সুখেই দিন কাটাইতে পারিবে।

সেন্মুখী অপরাজিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আর বড় অধিক দিন বিলম্ব নাই এই তিন দিনের মধ্যেই খোকার অন্নপ্রাসনের আয়োজন কর. কাল করিতে পারিলেই ভাল হয়। অপরাজিতা বলিলেন, তাই হবে, আমরা ত সব সন্ন্যাসীর দল যে দিন যা মনে করিব সেই দিন তাই হইবে ইহাতে আর ধুমধাম কি আছে পুরোহিত আসিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করুক আপনারা ত উপস্থিত থাকিবেন, আপনারা যথারীতি সে কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। পর দিন হুকুম মত খোকার অন্নপ্রাসন হইল, দরিয়া আত্ম পরিচয় সবই টের পাইল শুইয়া শুইয়া সবই দেখিল। কর্ম্মের কোনও ত্রুটিই হইল না। শেষে খোকার সেই অন্নপ্রাসনের চরু এক চামচ—নিজে খাইয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষনেক পরে দরিয়ার শ্বাসের লক্ষণ হইল। বিজয়কে সে

ডাকাইয়া পাঠাইল বিজয় কাষ্ঠপুত্তলিকার মত কাছে আসিল। দরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—আমি চলিলাম একটা গান শুনবে? কাছে এস, খুব কাছে আমার ঠোটের উপর কান দিয়া বস। সে কণ্ঠ নাই কিন্তু বাসনা আছে অনেক লীলাই করিয়াছি কি না, সে সংস্কার যাইবে কোথায় এই বলিয়া শীর্ণ দুই বাহু বিস্তার করিয়া বিজয়ের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল এবং অস্ফুটস্বরে গান ধরিল,—

এত দিনে ঘুচলো শ্যাম তোমার রাঙ্গা পদাশ্রয়।
জনম দুঃখিনী জনমের মত বিদায় হয়॥

কতক শোনা গেল কতক শোনা গেল না, এমনভাবে গানটি গাহিয়া দরিয়ার শ্রান্ত হেট্‌ মাথাখানি ধপ করিয়া বালিশের উপর পড়িল হাত দুইখানি এলাইয়া গেল, আর বাতায়ন পথে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের একটি কিরণ রেখা আসিয়া দরিয়ার মাথার উপর পড়িল। সে ক্ষুদ্র মস্তক সে বালিকা সুলভ বদন, সে শীর্ণ কলকণ্ঠ সান্ধ্য সূর্য্যের স্পর্শে কনকময় হইয়া উঠিল। কি যেন একটা দৈবজ্যোতিঃ আসিয়া দরিয়ার দেহকে মণ্ডিত করিয়া তুলিল। এমন সময় সেনুমী ও সন্ন্যাসিনী কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "চলিয়া গেলে মা।" তখন নীচে বিমলের কাঁধে বসিয়া খোকা খিলখিল করিয়া হাঁসিতেছিল।

দরিয়া সত্যই চলিয়া গেল।

সমাপ্ত।